বাউন্ডেলের ডায়েরি

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম : জীবনপঞ্জি

জন্ম : ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬; ২৪ মে, ১৮৯৯। গ্রাম : চুরুলিয়া; থানা : জামুরিয়া; মহকুমা : আসানসোল; জেলা : বর্ধমান; পশ্চিমবঙ্গ। ডাক নাম : 'দুখু মিয়া' ও 'তারা খ্যাপা'। পিতা : কাজী ফকির আহমদ; মাতা : জাহেদা খাতুন।

ব্যক্তি জীবন : ১৯০৮ সালে কবির পিতার মৃত্যু। ১৯১০ সালে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ। একই সময়ে মোল্লাগিরি, মাজার শরিফের খাদেমগিরি ও মসজিদের ইমামতি করতেন। ১৯১১ সালে বর্ধমানের মাথরুন হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠ –এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। রানিগঞ্জে এক খ্রিস্টান গার্ডের বাসায় বাবুর্চিগিরি। আসানসোলে এম. বখশের রুটির দোকানে চাকরি। পুলিশ ইনসপেক্টর কাজী রফিকউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় এবং ময়মনসিংহে গমন। ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাই স্কুলে ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত পাঠ। পালিয়ে আবার রানিগঞ্জে। ১৯১৫ সালে সিয়ারশোল হাই স্কুলে ক্লাশ এইটে ভর্তি। ১৯১৭ সালে, নজরুল তখন ক্লাশ টেনের ছাত্র, প্রি-টেস্ট পরীক্ষাকালে নাম লেখান ৪৯-নম্বর বাঙালি পল্টনে। নৌশেরা-র ট্রেনিং শেষে স্থায়ীভাবে করাচিতে। 'ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার' পদে উন্নীত। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে দেশে ফিরে এলেন। মার্চ মাসে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলো। নজরুল কলকাতায়, প্রথমে বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দের মেসে, পরে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসের একই ঘরে অবস্থান। ১৯২১ সালে কুমিল্লায়, সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস বেগমের সঙ্গে আকদ। ১৯২২ সালে নজরুলের আনন্দময়ীর আগমনে ও অন্য একটি রচনার জন্য সম্পাদক নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা। কুমিল্লায় নজরুল গ্রেফতার। ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসে বিচারে নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জেল থেকে মুক্তি পান ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে। ১৯২৪ সালে কবির বিবাহ সম্পন্ন হয় কলকাতায়, প্রমীলা সেনগুপ্তর (আশালতা সেনগুপ্ত) সঙ্গে, ইসলামী ধর্মমতে। ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যপদ লাভ। একই বছরে 'ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি'র অন্তর্ভুক্ত 'মজুর স্বরাজ পার্টি গঠনে অংশগ্রহণ। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে অবস্থান। ১৯২৬ সালে কবির প্রথম পুত্র বুলবুলের জন্ম। ১৯৩০ সালে "প্রলয়-শিখা" কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত এবং নজরুলের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ শেষ পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকরী হয়নি। ঐ বছরেই বুলবুলের মৃত্যু। নজরুলের অন্য দুই পুত্র : কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনুরুদ্ধ। ১৯৩৯ সালে কবি-পত্নী প্রতিমা নজরুল পক্ষাঘাত রোগগ্রস্থ। ১৯৪২ সালে নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। লুম্বিনী পার্কের রাঁচি মেন্টাল হসপিটালে এক বছর চিকিৎসা করেও কোনো উপকার হলো না। ১৯৪৬ সালে প্রথমে ইংল্যান্ড ও পরে জার্মানীতে চিকিৎসার্থে প্রেরণ করা হয়। সব ডাক্তারেরই অভিমত, তাঁর রোগ চিকিৎসার অতীত। ঐ বছরের শেষে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯৬২ সালে কবি-পত্নীর মৃত্যু। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে যান।

মৃত্যু : ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬; ১২ ভাদ্র, ১৩৮৩। পি.জি. হাসপাতাল, ঢাকা। সেদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ-সংলগ্ন গোরস্থানে সমাহিত।

www.nagorikpathagar.org

সাহিত্য জীবন

শৈশব-কৈশোরে চাচা কাজী বজলে করিমের কাছে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা। স্থানীয় লেটো দলের জন্য বাংলা-উর্দু-ফারসি-ইংরেজি শোনা ভাষায় গীতিকাব্য, প্রহসন, পাঁচালি, কবিগান (শকুনিবধ, মেঘনাদ-বধ, রাজপুত্র, 'চাষার সং' প্রভৃতি) রচনা। স্কুলে কবিতাচর্চা, ফারসি শিক্ষা। বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি অবস্থানকালে আরো ফারসি ভাষা-সাহিত্যের চর্চা। সেখান থেকেই গল্প পাঠান 'সওগাত' পত্রিকায়, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'সওগাত' এ প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সংখ্যায়। এটিই নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩২৬)। প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' প্রকাশিত হয় 'সওগাত' (কার্তিক ১৩২৬)। ছাপার হরফে নজরুলের আত্মপ্রকাশ ১৯১৯ সালে। অত্যল্পকালের মধ্যেই নজরুল সাহিত্যের একজন প্রধান নায়কে বৃত হন। ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে 'বিদ্রোহী' (লেখা হয়েছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে) কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম গ্রন্থ, গদ্যপ্রবন্ধ 'যুগ-বাণী' (১৯২২)। প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২)। তাঁর ২৩ বছরের শিল্পজীবনে নজরুল লেখেন ২২টি কবিতা গ্রন্থ, ৩টি কাব্যানুবাদ, ২টি কিশোর কাব্য, ৩টি উপন্যাস, ৩টি গল্পগ্রন্থ, ৩টি নাটক, ২টি কিশোর-নাটিকা, ৫টি প্রবন্ধগ্রন্থ, ১৪টি সঙ্গীতগ্রন্থ। তাঁর রচিত গানের প্রকৃত সংখ্যা এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায় নি।

www.nagorikpathagar.org

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী

কাজী নজরুল ইসলাম

সম্পাদনায়

খিলখিল কাজী

It's a Personal Collection of
Sazaul Morshed Sazib
NSTU, Pharmacy (5th Batch)
Cell: 01918165031
Book No:
Date :
mail : sazibpharmacy.nstu@gmail.com

সাহিত্য কথা

www.nagorikpathagar.org

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী
কাজী নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল
একুশে বইমেলা ২০১২

প্রকাশক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
সাহিত্য কথা
আহাম্মদ কমপ্লেক্স (২য় তলা)
(৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭৩১২৯২৬১৭

গ্রন্থস্বত্ব
খিলখিল কাজী

প্রচ্ছদ
মোমিনউদ্দিন খালেদ

বর্ণবিন্যাস
সাবিত কম্পিউটার সার্ভিস

মুদ্রণ
গাউছিয়া প্রিন্টিং প্রেস
৪৫/খ/২ রজনী চৌধুরী রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

মূল্য : একশত বিশ টাকা মাত্র

Baundaler Uttakahini By Kazi Nazrul Islam
Published by Mohammad Mizanur Rahman, Shahatta Katha
40/41 Banglabazar, Dhaka-1100.
Price : Tk. 120.00 Only US $ 3

ISBN : 984-70315-0084-7

www.nagorikpathagar.org

উ ৎ স র্গ

যারা গড়বে সুন্দর এই দেশটাকে
চিরসুন্দর সেই কিশোরদের প্রতি

It's a Personal Collection of
Sazaul Morshed Sazib
NSTU, Pharmacy (5th Batch)
Cell: 01918165031
Book No:
Date :
mail : sazibpharmacy.nstu@gmail.com

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবেও পরিচিত। তাঁর রচনার মধ্যে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' একটি ভিন্নধর্মী রচনা। তিনি যখন যে পরিবেশে থেকেছেন, সেই পরিবেশকে কেন্দ্র করেই রচনা করেছেন– গল্প, উপন্যাস, গদ্য ও পদ্য। ছোটদেরকে কেন্দ্র করে তাঁর যে সকল রচনা দেখা যায় তার মধ্যে বাউণ্ডুলে স্বভাবও পরিলক্ষিত হয়।

কিশোর বয়স থেকেই তিনি উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে যে সব রচনা তৈরি করেছেন, সেগুলো এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যেমন– পদ্ম গোখ্‌রো, ঈদের দিনে, চাদর, মরা কাউয়া, ভূতের ভয়, জাগো সুন্দর চিরকিশোর, কানামাছি, নবার নামতা পাঠ, জুজুবুড়ির ভয়, ছিনিমিনি খেলা, পুতুলের বিয়ে, চিঠিপত্র, যৌবনের গান, তরুণের সাধনা এ সবগুলো রচনার মধ্যেই তাঁর দূরন্তপনা ভাবটা ফুটে ওঠে।

তাঁর শিশুতোষ রচনাগুলো পড়লে বোঝা যায়, এক একটা রচনা এক একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। কানামাছি খেলাটা তাঁরই আবিস্কার। তিনি সমবয়সীদের নিয়ে কানামাছি খেলেছেন, পুতুল খেলেছেন। অন্যদেরকে ভূতের ভয়, জুজুবুড়ির ভয় দেখিয়ে গল্প লিখেছেন। তিনি উপদেশ দিয়েছেন শিশুদের, তিনি জাগ্রত থাকতে বলেছেন কিশোরদেরকে। আনন্দ উপভোগ করেছেন, সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে। ঈদের দিনে রচনায় আমরা বুঝতে পারি, এ রচনার ক্ষেত্রে তাঁদের আনন্দ কতটুকু ছিল।

তিনি পালাগান শুনতে গিয়ে, নতুন নতুন পালাগান রচনা করেছেন। তরুণদের নিয়ে তাঁর সাধনা ছিল ভিন্ন রকমের। যৌবনের জয়গান গেয়েছেন তরুণদের নিয়ে।

কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে আমরা যত কথাই বলি না কেন, তাঁর গুনগান শেষ হবে না, পরিশেষে তাঁর বিদ্রোহী কবিতার দুটি লাইন দিয়ে শেষ করছি, অসাধারণ এই কবিতার কথা। তিনি নিজেই লিখেছেন,

আমি
তাই করি ভাই,
যখন চাহে এ মন যা,
করি
শত্রুর সাথে গলাগলি,
ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।

– প্রকাশক

www.nagorikpathagar.org

সূ চি প ত্র

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী	৯
পদ্ম গোখ্‌রো	১৯
ঈদের দিনে	৩৫
চাদর	৩৬
মরা কাউয়া	৩৭
ভূতের ভয়	৩৮
জাগো সুন্দর চিরকিশোর	৫৩
কানামাছি	৬১
নবার নামতা পাঠ	৬৩
জুজুবুড়ির ভয়	৬৫
ছিনিমিনি খেলা	৬৭
পুতুলের বিয়ে	৬৯
চিঠিপত্র	৮২
যৌবনের গান	৮৪
তরুণের সাধনা	৮৭

www.nagorikpathagar.org

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী

[ক]

[বাঙালি পল্টনের একটি বওয়াটে যুবক আমার কাছে তাহার কাহিনী বলিয়াছিল নেশার ঝোঁকে : নিচে তাহাই লেখা হইল। সে বোগদাদে গিয়া মারা পড়ে।]

'কি ভায়া! নিতান্তই ছাড়বে না? একদম এঁটেল মাটির মতো লেগে থাকবে? আরে, ছোঃ! তুমি যে দেখছি চিটে গুড়ের চেয়েও চামচিটেল! তুমি যদিও হচ্ছ আমার এক গ্লাসের ইয়ার, তবুও সত্যি বলতে কি, আমার সেসব কথাগুলো বলতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। কারণ খোদা আমায় পয়দা করবার সময় মস্ত একটা গলদ করে বসেছিলেন, কেননা চামড়াটা আমার করে দিলেন হাতির চেয়েও পুরু, আর প্রাণটা করে দিলেন কাদার চেয়েও নরম! আর কাছেই দু-চার জন মজুর লাগিয়ে আমার এই চামড়ায় মুগুর বসালেও আমি গোঁপে তা দিয়ে বলব, 'কচু পরওয়া নেই, কিন্তু আমার এই 'নাজোক', জানাটায় একটু আঁচড় লাগলেই ছোট্ট মেয়ের মতো চেঁচিয়ে উঠব! তোমার 'বিরাশি দশ আনা' ওজনের কিলগুলো আমার এই স্থূল চর্মে স্রেফ আরাম দেওয়া ভিন্ন আর কোনো ফলোৎপাদন করতে পারে না, কিন্তু যখনই পাকড়ে বসো, 'ভাই, তোমার সকল কথা খুলে বলতে হবে', তখন আমার অন্তরাত্মা ধুকধুক করে ওঠে, পৃথিবী ঘোরার ভৌগোলিক সত্যটা তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। চক্ষেও যে সর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে পারে বা জোনাকি পোকা জ্বলে উঠতে পারে, তা আমার মতো এই রকম শোচনীয় অবস্থায় পড়লে তুমিও অস্বীকার করবে না।

[খ]

হাঁ, আমার ছোটকালের কোনো কথা বিশেষ ইয়াদ হয় না। আর আবছায়া রকমের একটু একটু মনে পড়লেও তাতে তেমন কোনো রস বা রোমান্স (বৈচিত্র্য) নেই! সেই সরকারি রাম-শ্যামের মতো পিতামাতার অত্যধিক স্নেহ, পড়ালেখায় নবডঙ্কা, ঝুলঝাপপুর ডাণ্ডাগুলি খেলায় দ্বিতীয় নাস্তি, দুষ্টামি-নষ্টামি নন্দদুলাল কৃষ্ণের তদানীন্তন অবতার, আর ছেলেদের দলে অপ্রতিহত প্রভাবে আলেকজান্ডার দি গ্রেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ! আমার অনুগ্রহে ও নিগ্রহে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা বিশেষ

www.nagorikpathagar.org

খোশ ছিলেন কিনা, তা আমি কারুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি না; তবে সকলেই আমার পরমার্থ কল্যাণের জন্য যে সকাল-সন্ধ্যে প্রার্থনা করত সেটা আমার তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় না-ওয়াকেফ ছিল না। একটা প্রবাদ আছে, 'উৎপাত করলেই চিৎপাত হতে হয়।' সুতরাং এটা বলাই বাহুল্য যে, আমার পক্ষেও উক্ত মহাবাক্যটির ব্যতিক্রম হয়নি, বরং ও কথাটা ভয়ানকভাবেই আমার উপর খেটেছিল; কারণ ঘটনাচক্রে যখন আমি আমার জননীয় কক্ষচ্যুত হয়ে সংসারের কর্মবহুল ফুটপাতে চিৎপাত হয়ে পপাত হলুম, তখন কত শত কর্মব্যস্ত সবুট-ঠ্যাং যে অহম-বেচারার ব্যথিত পাজরের উপর দিয়ে চলে গেল, তার হিসেবে রাখতে শুভঙ্কর দাদাও হার মেনে যায়। থাক আমার সেসব নীরস কথা আউড়িয়ে তোমার আর পিত্তি জ্বালাব না। শুনবে মজা?

একদিন পাঠশালায় বসে আমি বঙ্কিমবাবুর মুচিরাম গুড়ের অনুকরণে ছেলেদের মজলিস সর-গরম করে আবৃত্তি করছিলুম, 'মাননীয় রাধে! একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও!' এতে শ্রীমতি রাধার মানভঞ্জন হয়েছিল কিনা জানবার অবসর পাইনি, কারণ নেপথ্যে ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে 'আরে রে, দুর্বৃত্ত পামর' বলে হুঙ্কার করে আমার ঘাড়ে এসে পড়লেন সশরীরে আমাদের আর্কমার্কা পণ্ডিতমশাই। যবনিকার অন্তরালে যে যাত্রার দলের ভীম মশাইয়ের মতো ভীষণ পণ্ডিতমশাই অবস্থান করছিলেন, তা এ নাবালকের একেবারেই জানা ছিল না। তার ক্রোধ-বহ্নি যে দুর্বাসার চেয়েও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তা আমি বিশেষরকম উপলব্ধি করলুম তখন, যখন তিনি একটা প্রকাণ্ড মেষের মতো এসে আমার নাতিদীর্ঘ শ্রবণেন্দ্রিয় দু'টি ধরে দেওয়ালের সঙ্গে মাথাটার বিষম সংঘর্ষণ আরম্ভ করলেন। তখনকার পুরোদস্তুর সংঘর্ষণের ফলে কোনো নূতন বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উদ্ভবন হয়নি সত্য, কিন্তু আমার সর্ব শরীরের 'ইলেকট্রিসিটি' যে সাংঘাতিক রকম ছুটাছুটি করেছিল, সেটা অস্বীকার করতে পারব না। মার খেয়ে খেয়ে ইটপাটকেলের মতো আমার এই শক্ত শরীরটা যত না কষ্ট অনুভব করেছিল, তাঁর সালঙ্কার গালাগালির তোড়ে তার চেয়ে অনেক কষ্ট অনুভব করেছিল আমার মনটা। আদৌ মুখরোচক নয় এরূপ কতকগুলো অখাদ্য তিনি আমার পিতৃপুরুষের মুখে দিচ্ছিলেন, এবং একেবারেই সম্ভব নয় এরূপ কতকগুলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দাবি আমার কাছে করেছিলেন। তাঁর পাঁচপুয়া পরিমিত চৈতন্য চুটকিটা ভেক-ছানাসম শিরোপরি অস্বাভাবিক রকমের লম্ফ-ঝম্ফ প্রদান করছিল। সঙ্গে সঙ্গে খুব হাসিও পাচ্ছিল, কারণ 'চৈতন তেড়ে ওঠার' নিগূঢ় অর্থ সেদিন আমি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলুম! ক্রমে যখন দেখলুম, তাঁর এ প্রহারের কবিতায়

www.nagorikpathagar.org

আদৌ যতি বা বিরামের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, তখন আর বরদাস্ত হলো না! জানো তো, পুরুষের রাগ আনাগোনা করে আমিও তাই, ঐখানেই একটা হেস্তনেস্ত করে দেবার অভিপ্রায়ে তার খাঁড়ার মতো নাকটায় বেশ মাঝারি গোছের একটা ঘুষি বাগিয়ে দিয়ে বীরের মতো সটান স্বগৃহাভিমুখে হাওয়া দিলুম। বাড়ি গিয়েও আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করলুম না। তাই পিতৃভয়ে সেধুলুম গিয়ে একেবারে চালের মরাইয়ে; উদ্দেশ্য, এরূপ নিভৃত স্থান হতে কেউ আর সহজে আবিষ্কার করতে পারবে না– কি জানি কখন কি হয়! খানিক পরে–আমার সেই গুপ্তপুর হতেই শুনতে পেলুম পণ্ডিতমশাই ততক্ষণে সালঙ্কারে আমার জন্মদাতার কাছে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন যে, আমার মতো দুর্ধর্ষ বাউণ্ডেলে ছোকরার লেখা-পড়া তো 'ক' অক্ষর গোমাংস, তদুপরি গুরুমশাইয়ের নাসিকায় গুরুপ্রহার ও গুরুপত্নীর নিন্দাবাদ অপরাধে আপাতত এই দুনিয়াতেই আমাকে লোখুঠুটোর মতো চাটু হস্তে মাছি মারতে হবে, অর্থাৎ কুষ্ঠব্যাধি হবে, তারপর নরকে যাতে আমার 'স্পেশাল' (বিশেষ) শাস্তির বন্দোবস্ত হয়, তার জন্যেও নাকি তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ঠিকঠাক করতে পারেন। প্রথমত অভিশাপটার ভয়ে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম। গুরুপত্নীর নিন্দাবাদ কথাটা আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে অবগত হলুম, পণ্ডিতমশাইয়ের অর্ধাঙ্গিনীর নামও নাকি শ্রীমতী রাধা, আর তাঁর এক আধটু গুড়ুক খাওয়ারও নাকি অভ্যাস আছে, অবিশ্যি সেটা স্বামীদেবতার অগোচারেই সম্পন্ন হয়, আমি নাকি তাই দেখে এসে ছেলেদের কাছে স্বহস্তে গুড়ুক সেজে অভিমানিনী শ্রীমতি রাধার মানভঞ্জনার্থ করুণ মর্মস্পর্শী সুরে উপরোধ করছিলুম, "মানময়ী রাধে, একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও' –আর পণ্ডিতমশাই অন্তরালে থেকে সব শুনছিলেন। আমার আর বরদাশত হলো না, চালের মরাইয়ে থেকেই উসখুস করতে লাগলুম, ইতিমধ্যে গরমেও আমি রীতিমত গলদঘর্ম হয়ে উঠেছিলুম। আমি মোটেই জানতুম না পণ্ডিতমশাইয়ের গিন্নীর নাম শ্রীমতী রাধা– আর তিনি যে গুড়ুক খান, তা তো বিলকুলই জানতুম না। কাজেই এতগুলো সত্যের অপলাপে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না, তুড়ুক করে চারের মরাই হতে পিতৃসমীপে লাফিয়ে পড়ে, আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্যে অশ্রুগদগদ-কণ্ঠে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ করতে লাগলুম, কিন্তু ততক্ষণে ক্রোধান্ধ পিতা আমার আপিল অগ্রাহ্য করে ঘোড়ার গোগালচির মতো আমার সামনের লম্বা চুলগুলো ধরে দমাদ্দম প্রহার জুড়ে দিলেন। বাস্তবিক, সে রকম প্রহার আমি জীবনে আশা করিনি। চপেটাঘাত, মুখ্যাঘাত, পদাঘাত ইত্যাদি চার হাত-পায়ের যত রকম আঘাত আজ পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

আবিস্কৃত হয়েছে, সব যেন রবিবাবুর গানের ভাষারও শ্রাবণের ধারার মতো পড়তে লাগল আমার মুখের পরে-পিঠের পরে। সেদিনকার পিটুনি খেয়ে আমার পৃষ্ঠদেশ বেশ বুঝতে পেয়েছিল যে, তার 'পিঠ' নাম সার্থক হয়েছে। একেই আমাদের ভাষায় বলে, 'পেদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেওয়া।' বৃন্দাবন না দেখি তার পরদিনই কিন্তু বাবা আমায় বর্ধমান এনে 'নিউ স্কুলে' ভর্তি করে দিলেন! কি করি, আমি নাচারের মতো সব সহ্য করতে লাগলুম– কথায় বলে 'ধরে মারে, না সয় ভালো।'

[গ]

'প্রথম প্রথম শহরে এসে আমার মতো পাড়াগেঁয়ে গোয়ারকে বিষম বিব্রত হয়ে উঠতে হয়েছিল, বিশেষ করে শহরে ছোকরাদের দৌরাত্মিতে। সে ব্যাটারা পাড়ায়ে ছেলেগুলোকে যেন ইঁদুর-প্যাঁচার মতো পেয়ে বসে। যাহোক, অল্পদিনেই আমি শহুরে কায়দায় কেতা-দুরস্ত হয়ে উঠলুম! ক্রমে 'অহম' পাড়া-গেঁয়ে ভূতই আবার তাদের দলের একজন হুমরো-চুমরো ওস্তাদ ছোকরা হয়ে পড়ল। সেই আগেকার পগেয়া-খচ্চর ছেলেগুলোই এখন আমায় বেশ একটু সমীহ করে চলতে লাগল– বাবা, এ শর্মার কাছে বেঁড়ে ওস্তাদি, এ ছেলে হচ্ছে অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি! দেখতে দেখতে পড়ালেখায় যত না উন্নতি করলুম, তার চেয়ে বহুল পরিমাণে উন্নতি করলুম রাজ্যের যত দুষ্টুমির গবেষণায়। তখন আমায় দেখলে বর্ধমানের মতো পবিত্র স্থানও তটস্থ হয়ে উঠত। ক্রমে আমাদের মস্ত একটা দল পেকে উঠল। পুলিশের ঘাড়ে দিনকতক এগারো-ইঞ্চি ঝাড়তেই তারা আমাদের সঙ্গে গুপ্ত সন্ধি করে ফেললে। এইরূপে ক্রমেই আমি নিচু দিক গড়িয়ে যেতে লাগলুম– তাই বলে যে আমাদের দিয়ে কোনো ভালো কাজ হয়নি, তা বলতে পারবে না। মিশন, কুষ্ঠরোগ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আমাদের এই বওয়াটে ছেলেদের দল যা করেছে তার শতাংশের একাংশও করে উঠতে পারেনি ঐ গোবেচারা নিরীহ ছাত্রের দল। তারা আমাদের মতো অমন অদম্য উৎসাহ-ক্ষমতা পাবে কোথায়? তারা তো শুধু বইয়ের পোকা। বর্ধমান যখন ডুবে যায়, তখন আমরাই শহরের সিকি লোককে বাঁচিয়েছিলুম, সে সময়ে আমাদের দলের অনেকে নিজের জীবন উৎসর্গ করে আর্তের জীবন রক্ষা করেছি! কনফারেন্সের, সভা-সমিতির চাঁদা আদায়ের প্রধান উদ্যোগ আয়োজনের প্রধান পাণ্ডা ছিলুম আমরা। আমাদেরই চেষ্টায় 'স্পার্টস, 'জিমনাস্টিক, সার্কাস, থিয়েটার, ক্লাব প্রভৃতি আড্ডাগুলোর অস্তিত্ব অনেকদিন ধরে লোপ পায়নি।

www.nagorikpathagar.org

পিতার অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও মাসোহারাটা ঠিকরকমই পাঠাতেন। তিনি তো আর আমার এতদূর উন্নতির আশা করেননি, আর এত খবরও রাখতেন না। কারণ কোনো ক্লাসে আমার 'প্রমোশন' স্টপ হয়নি। বহু গবেষণার ফলেও হেড মাস্টার মহাশয় আবিষ্কার করতে পারেননি– আমার মতো বওয়াটে ছোকরা কি করে পাসের নম্বর রাখে। ভায়া, ঐখানেই তো genius-এর (প্রতিভার) পরিচয়! –'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।' পরীক্ষার সময় চার-পাঁচজোড়া অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আমার পেছনে লেগে থাকতই, কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর যার কূল-কিনারা পান না, তাকে ধরবেন পদীর ভাই গৌরীশঙ্কর। তাছাড়া খালি চুরি বিদ্যায় কি চলে? এতে অনেক মাথা ঘামাতে হয়। পরীক্ষকের ঘর হতে তাঁর ছেলে বা অন্য কোনো ক্ষুদ্র আত্মীয়ের থ্রু দিয়ে রজত চক্রের বিনিময়ে খাতাটি বেমালুম বদলে ফেলা, প্রেস হতে প্রশ্ন চুরি, প্রভৃতি অনেক বুদ্ধিই এ শর্মার আয়ত্ত ছিল। সেসব শুনলে তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠবে! –যাহোক, এই রকমেই 'যেন তেন প্রকারেণ' থার্ড ক্লাসের চৌকাঠে পা দিলুম গিয়ে।

বাড়ি খুব কম যেতুম, কারণ পাড়াগাঁ তখন আর ভালো লাগত না। পিতাও বাড়ি না গেলে দুঃখিত হতেন না, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল, আমি এইবার একটা কিছু না হয়ে যাই না। আমাদের গ্রামের কুল্লে আমিই পড়তে এসেছিলুম ইংরেজি স্কুলে, তার উপর আমি নাকি পাশগুলো পঙ্খীরাজ ঘোড়ার মতো তড়াতর ডিঙিয়ে যাচ্ছিলুম! কেবল একজনের আঁখি দু'টি সর্বদাই আমার পথপানে চেয়ে থাকত, তিনি আমার স্নেহময়ী জননী! মায়ের মন তো এত শত বোঝে না, তাই দুমাস বাড়ি না গেলেই মা কেঁদে আঁকুল হতেন। সংসারে মার কাছ ভিন্ন আর কারুর কাছে একটু স্নেহ-আদর পাইনি। দুষ্টু বদমায়েস ছেলে বলে, আমায় যখন সকলেই মারত, ধমকাত, তখন মাই কেবল আমায় বুকে করে সান্ত্বনা দিতেন। আমার এই দুষ্টুমিটাই যেন তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগত। আমার পিঠে প্রহারের দাগগুলোয় তেল মালিশ করে দিতে দিতে কতদিন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুর নদী বয়ে গেছে।

যখন থার্ড ক্লাশে উঠলুম, তখন বোধ হয় মায়ের জিদেই বাবা আমায় চতুষ্পদ করে ফেললেন, অর্থাৎ বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমি কটিদেশ বন্ধনপূর্বক নানা ওজর আপত্তি দেখাতে লাগলুম, কিন্তু মায়ের আদালতে ও তাঁর অশ্রুজলের ওকালতিতে আমার সমস্ত ওজর বাতিল ও নামঞ্জুর হয়ে গেল। কি করি, যখন শুভদৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তো আর কথাই নাই। তাছাড়া কনেটি মন্দ ছিল না, আজকালকার বাজারে পাড়াগাঁয়ে ওরকম কনে শয়ে একটি মেলে না। বয়সও বারো-তেরো

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিল। ঐ বারো-তেরো বছরের কিশোরীটিকেই মা নাকি সোমত্ত মেয়ে দেখে বউ করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। আমারও বয়স তখন উনিশের কাছাকাছি। এতেই নাকি মেয়েমহলে মাকে কত কথা শুনতে হতো। প্রথম প্রথম কনে বৌ একটি পুটুলিরই মতো জড়সড় হয়ে তার নির্দিষ্ট একটি কোণে চুপ করে বসে থাকত। নববধূদের নাকি চোখ তেড়ে চাইতে নেই, তাই সে প্রায়ই চোখ বুজে থাকত। কিন্তু অনবরত চোখ বুঝে থাকা, সেও যে এক বীভৎস ব্যাপার, তাই সে দু-একবার অন্যের অলক্ষ্যে ভয়-চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নিত, যদি তার এই বেহায়াপনা কেউ দেখে ফেলে, তাহলেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি! আমাকে দেখলে তো আর কথাই নেই, নিজেকে কাছিমের মতো তৎক্ষণাৎ শাড়ি ওড়না প্রভৃতির ভিতর ছাপিয়ে ফেলত। তখন একজন প্রকাণ্ড অনুসন্ধিৎসু লোকের পক্ষেও বলা দুঃসাধ্য হয়ে উঠত, ওটা মানুষ, না কাপড়ের একটা বোঁচকা! তবে এটা আমার দৃষ্টি এড়াত না যে, আমি অন্যদিকে চাইলেই সে তার বেনারসি শাড়ির ভিতর থেকে চুরি করে আমার দিকে চেয়ে দেখত, কিন্তু আমি তার দিকে চাইতে না চাইতেই সে সটান চোখ দুটোকে বুজে ফেলে গম্ভীর হয়ে বসে থাকত, যেন আমায় দেখবার তার আদৌ গরজ নাই। আমি মুখ টিপে হাসতে হাসতে পালিয়ে এসে বাড়িময় উচ্চৈস্বরে বউয়ের লজ্জাহীনতার কথা প্রকাশ করে ফেলতুম। মা তো হেসেই অস্থির। বলতেন, 'হ্যাঁরে, তুই কি জনমভর এই রকম ক্ষ্যাপাই থাকবি?' আমার ভগ্নিগুলি কিন্তু কিছুতেই ছাড়বার পাত্রী নন' তাঁরা বউয়ের রীতিমতো কৈফিয়ত তলব করতেন। সে বেচারির তখনকার বিপদটা ভেবে আমার খুব আমোদ হতো, আমি হেসে লুটোপুটি যেতুম। যাহোক এ একটা খেলা মন্দ লাগছিল না। ক্রমে আমি বুঝতে পারলুম, 'কিশোরী কনে' আমায় ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে। আমি কিন্তু পারতপক্ষে তাকে জ্বালাতন করতে ছাড়তুম না। আমার পাগলামির ভয়ে সে বেচারি আমার সঙ্গে চোখাচোখি চাইতে পারত না, কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে সে যে আমার পানে তার পটলচেরা চোখ দু'টির ভাসা-ভাসা করুণ দৃষ্টি দিয়ে হাজার বার চেয়ে দেখত, তা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতুম, আর গুনগুন স্বরে গান ধরে দিতুম–

'সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়ানে
কেন, কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে।'

ক্রমে আমারও ভালোবাসা এই ছেলেমির মধ্যে দিয়ে এক আধটু করে বেরিয়ে পড়তে লাগল। তারপর পরীক্ষা নিকট দেখে শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা আমার আর বাড়িতে

www.nagorikpathagar.org

থাকা নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। আমি চলে আসার দিনে আর জ্যাঠামি দিয়ে হৃদয় লুকিয়ে রাখতে পারিনি। হাসতে গিয়ে অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত করেছিলুম। সজল নয়নে তার হাত দু'টি ধরে বলেছিলুম, 'আমার সকল দুষ্টুমি ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি, আমায় মনে রেখো।' সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না, কিন্তু তার ঐ চোখের জলই যে বলে দিলে সে আমায় কত ভালোবেসে ফেলেছে। আমি ছেড়ে দেবার পর সে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে অব্যক্ত স্বরে কাঁদতে লাগল। আমি চোখে রুমাল চেপে কোনো রকমে নিজের দুর্বলতাকে সম্বরণ করে ফেললুম। কে জানত, আমার সেই প্রথম সম্ভাষণই শেষ বিদায়-সম্ভাষণ– আমার সেই প্রথম চুম্বনই শেষ চুম্বন! কারণ, আর তাকে দেখতে পাইনি। আমি চলে আসবার মাস দুই পরেই পিত্রালয়ে সে আমায় চিরজনমের মতো কাঁদিয়ে চলে যায়। প্রথম যখন সংবাদটা পেলুম, তখন আমার কিছুতেই বিশ্বাস হলো না। এত বড় দুঃখ দিয়ে সে আমায় চলে যাবে? আমার এই আহত প্রাণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, না গো না, সে মরতেই পারে না! স্বামীকে না জানিয়ে সে এমন করে চলে যেতেই পারে না। সব শত্রু হয়ে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা জানিয়েছে। আমি পাগলের মতো রাবেয়াদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলুম। আমায় দেখে তাদের পুরানো শোক আবার নতুন করে জেগে উঠল। বাড়িময় এক উচ্চ ক্রন্দনের হাহাকার রোল আমার হৃদয়ে বজ্রের মতো এসে বাজল। আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লুম। ওগো, আর তার মৌন অশ্রুজল আমার পাষাণ বক্ষ সিক্ত করবে না? একটি কথাও যে বলতে পারেনি সে! সে যাবে না, কখনো যাবে না। হায় অভিমানিনি! ফিরে এস! ফিরে এস!

সে এল না, যখন নিঝুম রাত্তির, কেউ জেগে নেই, কেবল একটা ফেরু ফেউ ফেউ চিৎকার করে আমার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর করে তুলছিল, তখন একবার তার গোরের উপর দিয়ে উপুড় হয়ে পড়লুম– 'রাবেয়া! প্রিয়তমে! একবার ওঠো, আমি এসেছি, সকল দুষ্টুমি ছেড়ে এসেছি। আমার সারা বক্ষ জুড়ে যে তোমারই আলেখ্য আঁকা তাই দেখাতে এই নিভৃত গোরস্থানে নীরব যামিনীতে একা এসেছি। ওঠো, অভিমানিনী রাবেয়া আমার, কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না।' কবর ধরে সমস্ত রাত্তির কাঁদলুম, রাবেয়া এল না। আমার চারিদিকে একটা ঘূর্ণিবায়ু হুহু করে কেঁদে ফিরতে লাগল, ছোট্ট শিউলি গাছ থেকে শিশিরসিক্ত ফুলগুলো আমার মাথায় ঝরে পড়তে লাগল। ও আমার রাবেয়ার অশ্রুবিন্দু না কারুর সান্ত্বনা? দুএকটা ধসে যাওয়া কবরে দপ দপ করে আলেয়ার আলো জ্বলে উঠতে লাগল। আমি শিউরে উঠলুম। তখন ভোর হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সর্বাঙ্গে তার কবরের মাটি

www.nagorikpathagar.org

মেখে আবার ছুটে এলুম বর্ধমানে। হায়, সে তো চলে গেল, কিন্তু আমার প্রাণে স্মৃতির যে আগুন জ্বেলে গেল সে তো আর নিবল না। সে আগুন যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আমার বুক যে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। এই প্রাণ পোড়ানো স্মৃতির আগুন ছাড়া একটা কোনো নিদর্শন যে সে রেখে যায়নি, যাতে করে আমার প্রাণে এতটুকু সান্ত্বনা পেতুম।

সেই যে আঘাত পেলুম, তাতেই আমার বুকের পাঁজর ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। আমি আর উঠতে পারলুম না।

[ঘ]

'দিন যায়', থেমে থাকে না। আমারও নীরস দিনগুলো যেতে লাগল কোনো রকমে। ক্রমে ফার্স্ট ক্লাসে উঠলুম। তখন অনেকটা শুধরেছি। ইতিমধ্যে বর্ধমান নিউ স্কুল উঠে যাওয়ায়, তাছাড়া অন্য জায়গায় গেলে কতটা প্রকৃতিস্থ হতে পারব আশায়, আমি রানিগঞ্জে এসে পড়তে লাগলুম। আমাদের ভূতপূর্ব হেড-মাস্টার রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ-স্কুলের হেড মাস্টারি পদ পেয়েছিলেন। তাঁর পুরানো ছাত্র বলে তিনি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন, আমিও পড়া-লেখায় একটু মন দিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটা বিভ্রাট বেধে গেল, আমার আবার বিয়ে হয়ে গেল। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে, আমি এ বিয়েতে কোনো ওজর আপত্তি করিনি। তখন আমার মধ্যে সে উৎসাহ, সে একগুঁয়েমি আর ছিল না। রাবেয়ার মৃত্যুর সঙ্গে আমি যেন একেবারেই পরনির্ভরশীল বালকের মতো হয়ে পড়লুম। যে যা বলত তাতে উদাসীনের মতো 'হাঁ' বলে দিতুম। কোনো জিনিস তলিয়ে বুঝবার বা নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করবার ক্ষমতা যেন তখন আমার আদৌ ছিল না। আমার পাগলামি, হাসি সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এসবই দেখেই বোধ হয় মা আমার আবার বে' দেবার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া আমি আরো ভেবেছিলুম হয়তো এই নবোঢ়ার মধ্যেই আমার রাবেয়াকে ফিরে পাব, আর তার স্নেহকোমল স্পর্শ হয়তো আমার বুকের দারুণ শোক-যন্ত্রণার মধ্যে শান্তি আনতে পারবে। কিন্তু হায়! যার জীবন চিরকালই এই রকম বিষাদময় হবে বলে বিধাতার মন্তব্য বহিতে লিখিত হয়ে গেছে, তার 'সবর' ও 'শোকর' ভিন্ন 'নান্যগতি'। তার কপাল চিরদিনই পুড়বে। নববধূ সখিনা দেখতে শুনতে মন্দ নয়, তাই বলে ডানাকাটা পরিও নয়; আর আমার নিজের চেহারার গুণ বিচার না করে ওরকম

www.nagorikpathagar.org

একটি পরির কামনা করাও অন্যায় ও ধৃষ্টতা। গুণও আমার তুলনায় অনেক বেশি, সেসব বিষয়ে কোথাও খুঁৎ ছিল না। আজকালকার ছোকরারা নিতান্ত বেহায়ার মতো নিজে বৌ পছন্দ করে আনে। নিজের শরীর যে আবলুস কাঠের চেয়েও কালো বা কেঁদ কাঠের চেয়েও এবড়োথেবড়ো সেদিকে দৃষ্টি নেই, কিন্তু বৌটির হওয়া চাই দস্তুরমতো দুধে-আলতার রং, হরিণের মতো নয়ন, অন্তত পটলচেরা তো চাই-ই, সিংহের মতো কটিদেশ, চাঁদের মতো মুখ, কোকিলের মতো কণ্ঠস্বর, রাজহংসীর মতো গমন; রাতুল চরণকমল, কারণ মানভঞ্জনের সময় যদি 'দেহি পদপল্লবম উদাম' বলে তাঁর চরণ ধরে ধন্না দিতে হয়, আর সেই যে চরণ যদি God forbid (খোদা না করেন) গদাধরের পিসির ঠ্যাং-এর মতোই শক্ত কাঠপারা হয়, তাহলে বেচারারা একটা আরাম পাওয়া হতে যে বঞ্চিত হয়, আর বেজায় রসভঙ্গও হয়। তৎসঙ্গে আরো কত কি কবিপ্রসদ্ধির চিজবস্তু, সেসব আমার আর এখন ইয়াদ নেই। এইসব বোকারা ভুলেও ভাবে না যে, মেয়েগুলো নিতান্ত সতীলক্ষ্মী গোবেচারা জাত হলেও তাদেরও একটা পসন্দ আছে। তারাও ভালো বর পেতে চায়। আমরা যত সব পুরুষ মানুষ বেজায় স্বার্থপর বলে তাদের কোনো কষ্ট দেখেও দেখিনে। মেয়েদের 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না' ভাব আমি বিলকুল না পছন্দ করি। অন্তত যার সঙ্গে সারা জীবনটা কাটাতে হবে, পরোক্ষেও যদি তার সম্বন্ধে বেচারিরা কিছু বলতে কইতে না পায়, তবে তাদের পোড়াকপালি নাম সার্থক হয়েছে বলতে হবে। থাক, আমার মতো চুনোপুঁটির এসব ছেঁদো কথায় বিজ্ঞ সমাজ কেয়ার তো করবেনই না, অধিকন্তু হয়তো আমার মস্তক লোমশূন্য করে তাতে কোনো বিশেষ পদার্থ ঢেলে দিয়ে তাঁদের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দিবেন। অতএব আমি নিজের কথাই বলে যাই।

নব-পরিণীতা সখিনার এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে ভালোবাসতে পারলুম না। অনেক 'রিহার্স্যাল' দিলুম, কিছুতেই কিছু হলো না। হৃদয় নিয়ে এ ছিনিমিনি খেলার অভিনয় যেন আর ভালো লাগছিল না। তাছাড়া তুমি বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, রাবেয়া যেন আমার হৃদয় জুড়ে রানির মতো সিংহাসন পেতে বসেছিল, সেখানে অন্য কারুর প্রবেশাধিকার ছিল না। একনিষ্ঠ প্রেমে মানুষকে এতটা আত্মহারা যদি না করে ফেলত তবে 'কায়েস' 'মজনু' হয়ে লায়লির জন্য এমন করে বনে-পাহাড়ে ছুটে বেড়াত না, ফরহাদের ও-রকম পরিণাম হতো না। সখিনা কত ব্যথা পাচ্ছে বুঝতে পারতুম, কিন্তু হায় বুঝেও কিছু করতে পারতুম না। বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কর্তব্যের অবহেলা আমার বুকে কাঁটার মতো

www.nagorikpathagar.org

বিঁধছিল। মা ক্ষুণ্ন হলেন, বোনেরা বউকেই দোষী সাব্যস্ত করে তামিল করতে লাগল। কিন্তু কোথায় কি ফাঁক রয়ে গেল জানি না, কিছুতেই তার হৃদয়ের সঙ্গে আমার হৃদয়ের মিশ খেল না। সে কেঁদে মাটি ভিজিয়ে দিলে, তবু আমার মন ভিজল না। অনুশোচনার ও বাক্যজ্বালার যন্ত্রণায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এলুম। রাবেয়া আমার বুকে যে আঘাত করে গিয়েছিল তাই সইতে পারছিলুম না, তার উপর হা-খোদা, একি করলুম নিতান্ত অর্বাচীনের মতো? এ হতভাগিনীর জীবন কেন আমার সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে ফেলুম? অসহ্য এই বৃশ্চিক যন্ত্রণা কাঁটার ছুরির মতো আমার আগেকার আঘাতটায় খোঁচা মারতে লাগল। আমি পাগল হয়ে যাবার মতো হলুম। এরই মধ্যে রানিগঞ্জে এসে 'টেস্ট একজামিনেশন' দিলুম। সমস্ত বছর হট্টগোলে কাটিয়েছি। পাশ করব কোত্থেকে? আগেকার সে চুরি বিদ্যায়ও প্রবৃত্তি ছিল না—অর্থাৎ এখন সাফ বুঝতে পাচ্ছ যে, টেস্টে-এলাউ হইনি; সুতরাং ওটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন? এই শুভ সংবাদ বাবার কর্ণগোচর হবা মাত্র তিনি কিঞ্চিদধিক এক দিস্তা কাগজ খরচ করে আমায় বিচিত্র সম্ভাষণের উপসংহারে জানিয়ে দিলেন যে, আমার মতো কুপুত্তুরের লেখাপড়া ঐখানেই খতম হবে তা তিনি বহু পূর্বেই আন্দাজ করে রেখেছিলেন, অনর্থক এক রাশ টাকা জলে ফেলে দিলেন ইত্যাদি। আমার জানটা তেতোবেরক্ত হয়ে উঠল। দুত্তোর বলে দফতর গুটালুম; পরে, যা মনে আসতে লাগল তাই করতে লাগলুম। লোকে আমায় বহরমপুর যাবার জন্য বিনা ফি-তে যেচে উপদেশ দিতে লাগল। আমি তাদের কথায় 'ড্যামকেয়ার' করে দিনরাত বোঁ হয়ে রইলুম। দু-চারদিন সইতে সইতে শেষে একদিন বোর্ডিং সুপারিনটেন্ডেন্ট মশাই শুভক্ষণে আমায় অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিলেন। আমি ফের বর্ধমানে চলে এলুম। আমাদের ছত্রভঙ্গ দলের ভূতপূর্ব গুণ্ডাগণ আমায় সাদরে বরণ করে নিল। পিতা সব শুনে আমায় ত্যাজ্যপুত্র করলেন। এক বৎসর পরে খবর এল সখিনা আমায় নিষ্ঠুর পরিহাস করে অজানার রাজ্যে চলে গেছে। মরবার সময়ও নাকি হতভাগিনী আমার মতো পাপিষ্ঠের চরণ-ধুলোর জন্য কেঁদেছে, আমার ছেঁড়া পুরানো একটা ফটো বুকে ধরে মরেছে। ক্রমেই আমার রাস্তা ফর্সা হতে লাগল। আরো ছয় মাস পরে মা-ও চলে গেলেন। আমি তখন অট্টহাসি হেসে বোতলের পর বোতল উড়াতে লাগলুম। তারপর শুভক্ষণে পল্টনে এসে সেঁধিয়ে পড়লুম বোম কেদার নাথ বলে! আর এক গ্লাস জল দিতে পারো ভাই?

www.nagorikpathagar.org

পদ্ম গোখ্‌রো

রসুলপুরের মীর সাহেবদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া ফাঁপাইয়া উঠিল। লোকে কানা-ঘুষা করিতে লাগিল, তাহারা জীনের বা যক্ষের ধন পাইয়াছে। নতুবা এই দুই বৎসরের মধ্যে আলাদীনের প্রদীপ ব্যতীত কেহ এরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে না।

দশ বৎসর পূর্বেও মীর সাহেবদের অবস্থা দেশের কোনো জমিদারের অপেক্ষা হীন ছিল না সত্য, কিন্তু সে জমিদারি কয়েক বৎসরের মধ্যেই 'ছিল ঢেঁকি হল তুল, কাঁটতে কাটতে নির্মূল' অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের নওয়াবের সহিত টেক্কা দিয়া বিলাসিতা করিতে গিয়াই নাকি তাঁদের এই দুরবস্থায় সূত্রপাত।

লোকে বলে, তাঁহারা খড়মে পর্যন্ত সোনার ঘুঙুর লাগাইতেন। বর্তমান মীর সাহেবের পিতামহ নাকি স্নানের পূর্বে তেল মাখাইয়া দিবার জন্য এক গ্রোস যুবতী সুন্দরী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে স্বর্ণ-লঙ্কা দগ্ধ-লঙ্কায় পরিণত হইল। এমনকি তাঁহার পুত্রকে গ্রামেই একটি ক্ষুদ্র মক্তব চালাইয়া অর্ধ-অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে।

এমন পিতামহের পৌত্রের নিশ্চয়ই কোনো খান্দানি জমিদার বংশে বিবাহ হইল না। কিন্তু যে বাড়ির মেয়ের সহিত বিবাহ হইল, সে বাড়ির বংশ-মর্যাদা মীর সাহেবদের অপেক্ষা কম ত নয়ই, বরং অনেক বেশি।

বিলাসী মীর সাহেবের পৌত্রের নাম আরিফ। বধূর নাম জোহরা। জোহরার রূপের খ্যাতি চারিপাশের গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অত রূপ, অমন বংশ-মর্যাদা সত্ত্বেও দরিদ্র সৈয়দ সাহেবের কন্যাকে গ্রহণ করিতে কোনো নওয়াব-পুত্রের কোনো উৎসাহই দেখা গেল না।

মেয়ে গোঁজে বাঁধা থাকিয়া বুড়ি হইবে– ইহাও পিতামাতা সহ্য করিতে পারিলেন না। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমানে দরিদ্র মক্তব-শিক্ষক মীর সাহেবের পুত্র আরিফের হাতেই তাহাকে সমর্পণ করিয়া বাঁচিলেন।

মীর সাহেবদের আর সমস্ত ঐশ্বর্য উঠিয়া গেলেও রূপের ঐশ্বর্য আজও এতটুকু ম্লান হয় নাই। এবং এ রূপের জ্যোতি কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবদের রূপ খ্যাতিকেও লজ্জা দিয়া আসিয়াছে।

www.nagorikpathagar.org

কাজেই আরিফ ও জোহরা যখন বর-বধূ বেশে পাশাপাশি দাঁড়াইল, তখন সকলেরই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। যেন চাঁদে চাঁদে প্রতিযোগিতা।

পিতার মন খুঁত্‌খুঁত্‌ করিলেও জোহরার মাতার মন জামাতা ও কন্যার আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া প্রশান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

আনন্দে প্রেমে আবেশে শুভ দৃষ্টির সময় উভয়ের ডাগর চক্ষু ডাগরতর হইল।

আরিফের মাতা কিছুদিন হইতে চির-রুগণ হইয়া শয্যাশায়িনী ছিলেন। বধূ-মাতা আসিবার পর হইতেই তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন। আনন্দে গদগদ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৌমার পয়েই আমি সেরে উঠলাম, আমার ঘর আবার সোনা-দানায় ভরে উঠবে।'

গ্রামময় এই কথা পল্লবিত হইয়া প্রচার হইয়া পড়িল যে, মীর সাহেবদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মানুষের 'পয়' বলিয়া কোনো জিনিস আছে কিনা জানি না, কিন্তু জোহরার মীরবাড়িতে পদার্পণের পর হইতেই মীর সাহেবদের অবস্থা অভাবনীয় রূপে ভালো হইতে অধিকতর ভালোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গ্রামে প্রথমে রাষ্ট্র হইল, মীর সাহেবদের নববধূ আসিয়াই তাহাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়া উদ্ধার করিয়াছে, তাহাতেই মীরবাড়ির এই অপূর্ব পরিবর্তন।

গুজবটা একেবারে মিথ্যা নয়। জোহরা একদিন তাহার শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের একটা দেয়ালে একটা অস্বাভাবিক ফাটল দেখিয়া কৌতূহলবশেই সেটা পরীক্ষা করিতেছিল। হয়ত বা তাহার মন গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানী হইয়াই এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। তাহার কী মনে হইল, সে একটা লাঠি দিয়া সেই ফাটলে খোঁচা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জনের মত একটা শব্দ আসিতে সে ভয়ে পালাইয়া আসিয়া স্বামীকে খবর দিল।

বলা বাহুল্য, আরিফ নববধূকে অতিরিক্ত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। শুধু আরিফ নয়, শ্বশুর-শাশুড়ি পর্যন্ত জোহরাকে অত্যন্ত সু-নজরে দেখিয়াছিলেন।

জোহরার এই হঠকারিতায় আরিফ তাহাকে প্রথমে বকিল, তাহার পর সেইখানে গিয়া দেখিল, সত্য সত্যই ফাটলের ভিতর হইতে সর্প-গর্জন শ্রুত হইয়াছে। সে তাহার পিতাকে বাহির হইতেই ডাকিয়া আনিল।

পুত্র অপেক্ষা পিতা একটু বেশি দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ও সাপটাকে মারতেই হবে, নৈলে কখন বেরিয়ে কাউকে কামড়িয়ে বসবে। ওর গর্জন শুনে মনে হচ্ছে, ও নিশ্চয়ই জাত সাপ!" বলিয়া বধূমাতাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন।

www.nagorikpathagar.org

স্থানটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতি সন্তর্পণে তাহার খানিকটা পরিষ্কার করিয়া বার কতক খোঁচা দিতেই একটা বৃহৎ দুগ্ধধবল গোখ্‌রা সাপ বাহির হইয়া আসিল, মস্তকে তাহার সিন্দুর বর্ণ চক্র বা খড়মের চিহ্ন। আরিফ সাপটাকে মারিতে উদ্যত হইতেই পিতা বলিয়া উঠিলেন, "মারিস নে মারিস নে, ও বাস্তু সাপ। দেখছিস নে, ও যে পদ্ম গোখরো।

আরিফের উদ্যত যষ্টি হাতেই রহিয়া গেল। জঙ্গলের মধ্যে পদ্ম-গোখরো রূপী বাস্তু সাপ অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া আসিতেছিল। জোহরা আরিফকে আড়ালে ডাকিয়া বলির, 'তোমরা যখন সাপটাকে খোঁচাচ্ছিলে, তখন কেমন এক রকম শব্দ হচ্ছিল। ওখানে নিশ্চয়ই কাঁসা বা পিতলের কোন কিছু আছে।' আরিফের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আসিয়া তাহার পিতাকে বলিতে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, 'কই রে সে রকম কোন শব্দ ত শুনি নি।'

আরিফ বলিল, 'আমরা তখন সাপের ভয়েই অস্থির, কাজেই শব্দটা হয়ত শুনতে পাইনি।'

পিতা-পুত্র সন্তর্পণে দেয়ালের দুই-চারটি ইট সরাতেই দেখিতে পাইলেন, সত্যই ভিতরে কি চকচক করিতেছে।

পিতা-পুত্রে তখন পরম উৎসাহে ঘণ্টা দুই পরিশ্রমের পর যাহা উদ্ধার করিলেন, তাহাকে যক্ষের ধন বলা চলে না, কিন্তু তাহা সামান্যও নয়। বিশেষ করিয়া তাহাদের বর্তমান অবস্থায়।

একটি নাতিবৃহৎ পিতলের কলসি বাদশাহী আশরাফীতে পূর্ণ। কিন্তু এই কলসি উদ্ধার করিতে তাহাদের জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

কলসি উদ্ধার করিতে গিয়া আরিফ দেখিল, সেই কলসির কণ্ঠ জড়াইয়া আর একটা পদ্ম-গোখরো। আরিফ ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল,"ওরে বাপরে! সাপটা আবার এসেছে ঐখানে।'

জোহরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, "না, ওটা আর একটা। ওটারই জোড়া হবে বোধ হয়। প্রথমটা ওই দিকে চলে গেছে, আমি দেখেছি।'

কিন্তু এ সাপটা প্রথম হোক বা অন্য একটা হোক, কিছুতেই কলসি ছাড়িয়া যাইতে চায় না। অথচ পদ্ম-গোখরো মারিতেও নাই।

কলসির কণ্ঠ জড়াইয়া থাকিয়াই পদ্ম-গোখরো তখন মাঝে মাঝে ফণা বিস্তার করিয়া ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

www.nagorikpathagar.org

জোহরার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সে তাড়াতাড়ি এক বাটি দুধ আনিয়া নির্ভয়ে কলসির একটু দূরে রাখিতেই সাপটা কলসি ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। জোহরা সেই অবসরে পিতলের কলসি তুলিয়া লইল। সাপটা অনায়াসে তাহার হাতে ছোবল মারিতে পারিত, কিন্তু সে কিছু করিল না। একমনে দুগ্ধ পান করিতে করিতে ঝিঁঝিপোকার মত এক প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। একটু পরেই আর একটা পদ্মা-গোখরো আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে লাগিল।

জোহরা বলিয়া উঠিল, "ওই আগের সাপটা। এখনো গায়ে খোঁচার দাগ রয়েছে! আহা, দেখেছ, কী রকম নীল হয়ে গেছে।"

আরিফ ও তাহার পিতামাতা অবাক হয়ে বিস্ময়ে জোহরার কীর্তি দেখিতেছিল। ভয়ে বিস্ময়ে তাহাদেরও মনে ছিল না যে, তাহাকে এখনি সাপে কামড়াইতে পারে! এইবার তাহারা জোর করিয়া জোহরাকে টানিয়া সরাইয়া আনিল।

কলসিতে সোনার মোহর দেখিয়া আনন্দে তাহারা জোহরাকে লইয়া যে কী করিবে, কোথায় রাখিবে– ভাবিয়া পাইল না।

শ্বশুর-শাশুড়ি অশ্রুশিক্ত চোখে বারেবারে বলিতে লাগিলেন, "সত্যিই মা, তোর সাথে মীরবাড়ির লক্ষ্মী আবার ফিরে এলো।"

কিন্তু এই সংবাদ এই চারিটি প্রাণী ছাড়া গ্রামের আর কেহ জানিতে পারিল না। সেই মোহর গোপনে কলিকাতায় গলাইয়া বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে বর্তমান ক্ষুদ্র মীর-পরিবারের সহজ জীবনযাপন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত। কিন্তু বধূর 'পয়' দেখিয়াই বোধ হয়– আরিফ তাহারই কিছু টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যবসায় আশার অতিরিক্ত লাভ হইতে লাগিল।

বৎসর দুয়েকের মধ্যে মীরবাড়ির পুরাতন প্রাসাদের পরিপূর্ণ রূপে সংস্কার হইল। বাড়ি-ঘর আবার চাকর-দাসীতে ভরিয়া উঠিল।

পরে কর্পোরেশনের কন্ট্রাক্টরি হস্তগত করিয়া আরিফ বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল।

কোন কিছুরই অভাব থাকিল না, কিন্তু জোহরাকে লইয়া তাহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িল।

www.nagorikpathagar.org

॥ ২ ॥

এই অর্থ-প্রাপ্তির পর হইতেই জোহরা যেমন পদ্ম-গোখরো-যুগলের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-প্রবণ হইয়া উঠিল, সাপ দুইটিও জোহরার তেমনি অনুরাগী হইয়া পড়িল। অথবা হয়তো দুধ-কলার লোভেই তাহারা জোহরার পিছুপিছু ফিরিতে লাগিল।

জোহরার শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামী সাপের ভয়ে যেন প্রাণ হাতে করিয়া সর্বদা মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। বাস্তু সর্প– মারিতেও পারেন না, পাছে আবার এই দৈব অর্জিত অর্থ সহসা উবিয়া যায়।

অবশ্য সর্প-যুগল যেরূপ শান্ত ধীরভাবে বাড়ির সর্বত্র চলাফেরা করিতে লাগিল, তাহাতে ভয়ের কিছু ছিল না। তবু জাত সাপ ত! একবার ক্রুদ্ধ হইয়া ছোবল মারিলেই মৃত্যু যে অবধারিত।

পিতৃ-পিতামহের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাওয়াও এক প্রকার অসম্ভব। তাহারা কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না।

জোহরা হয়তো রান্না করিতেছে, হঠাৎ দেখা গেল সর্প-যুগল তাহার পায়ের কাছে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শাশুড়ি দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। বধূ তাহাদের তিরস্কার করিতেই তাহারা আবার নিঃশব্দে সরিয়া যায়।

বধূ-শাশুড়ি খাইতে বসিয়াছে, হঠাৎ বাস্তু সর্পদ্বয় আসিয়া বধূর ডালের বাটিতে চুমুক দিল! দুগ্ধ নয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ গর্জন করিয়া উঠিতেই বধূ আসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিতেই তাহারা ফণা নামাইয়া শুইয়া পড়ে, বধূ দুগ্ধ আনিয়া দেয়, খাইয়া তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

ভয়ে শাশুড়ির পেটের ভাত চাল হইয়া যায়।

ইহাও সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু সাপ দুইটি এইবার যে উৎপাত আরম্ভ করিল তাহাতে জোহরার স্বামী বাড়ি ছাড়িয়া কলিকাতা পলাইয়া বাঁচিল।

গভীর রাত্রে কাহার হিম স্পর্শে আরিফের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। উঠিয়া দেখে, তাহারই শয্যাপার্শ্বে পদ্ম-গোখরোদ্বয় তাহার বধূর বক্ষে আশ্রয় খুঁজিতেছে। সে চীৎকার করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাহির বাটিতে শয়ন করে।

জোহরা তিরস্কার করিলে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে ভীত সন্তানের মত তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া লুটাইয়া যেন কি মিনতি জানায়।

জোহরার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। আর তিরস্কার করিতে পারে না। বেদেনীদের মত নির্বিকার নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের আদর করে, পার্শ্বে ঘুমাইতে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

জোহরার বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে তাহার দু'টি যমজ সন্তান হইয়াই আঁতুড়ে মারা যায়। জোহরা স্মৃতি-পটে সেই শিশুদের ছবি জাগিয়া উঠে। তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃ চিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশু যুগলই যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে। তাহাদের মৃত্যুতে যে দংশন-জ্বালা সহ্য করিয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে, ইহারা যদি দংশনই করে তবুও তাহার অপেক্ষা ইহাদের দংশন-জ্বালা বুঝি তীব্র নয়। স্নেহ বুভুক্ষু তরুণী মাতার সন্তান হৃদয় মন করুণায় স্নেহে আপ্লুত হইয়া উঠে, ভয় ডর কোথায় চলিয়া যায়, আবিষ্টের মত সে ঐ সর্প শিশুদের লইয়া আদর করে, ঘুম পাড়ায়, সস্নেহে তিরস্কার করে।

স্বামী অসহায় ক্রোধে ফুলিতে থাকে, কিন্তু কোন উপায়ও নাই! তাহার ও তাহার প্রাণের অধিক প্রিয় বধূর মধ্যে এই উদ্যত ফণা ব্যবধান সে লঙ্ঘন করিতে পারে না। নিষ্ফল আক্রোশে অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরে।

পয়মন্ত বধূ-- তাহার উপরে রাগও করিতে পারে না। রাগ করিয়াই বা করিবে কি, তাহার ত কোনো অপরাধ নাই।

একদিন সে ক্রোধবেশে বলিয়াছিল, 'জোহরা তোমাকে ছেড়ে চাই না এই ঐশ্বর্য! মেরে ফেলি ও দুটোকে! এর চেয়ে আমার দারিদ্র্য ঢের বেশি শান্তিময় ছিল।'

জোহরা দুই চক্ষুতে অশ্রু ভরা আবেদন লইয়া নিষেধ করে। বলে, ওরা আমার ছেলে। ওরা ত কোন ক্ষতি করে না। কাউকে কামড়াতে জানে না ওরা।

আরিফ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, "তোমায় দংশন করে না ওরা, কিন্তু ওদের বিষের জ্বালায় আমি পুড়ে মলুম। আমার কি ক্ষতি যে ওরা করেছে, তা তুমি বুঝবে না, এর চেয়ে যদি ওরা সত্যি সত্যিই দংশন করত, তাও আমার পক্ষে এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের বেশি সুখের হত।"

জোহরা উত্তর দেয় না, নীরবে অশ্রু মোচন করে! ইহারা যে তাহারই মৃত খোকাদের অন্যরূপী আবির্ভাব বলিয়া সে মনে করে, তাহাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, সংস্কারে বাঁধে।

পিতা, পুত্র ও মাতা শেষে স্থির করিলেন, জোহরাকে কিছু দিনের জন্য তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। হয়ত সেখানে গিয়া সে ইহাদের ভুলিয়া যাইবে। এবং সর্প যুগলও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে।

একদিন প্রত্যুষে সহসা আরিফের পিতা জোহরাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা বহুদিন বাপের বাড়ি যাওনি, তোমার বাবাকে দু'তিনবার ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছি, আজ আরিফ নিয়ে যাবে, তুমি কিছুদিন সেখানে কাটিয়া এস।"

www.nagorikpathagar.org

জোহরা সব বুঝিল, বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিল না। নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিন্তু সাপ দুইটিকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

আরিফ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া ব্যবসা দেখিতে কলকাতা চলিয়া গেল।

জোহরার পিতা-মাতা কন্যার নিরাভরণ রূপই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজ সে যখন সালঙ্কারা বেশে স্বর্ণ-কান্তি স্বর্ণ–ভূষণে ঢাকিয়া গৃহে পদার্পণ করিল, দরিদ্র পিতা-মাতা তখন যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কন্যা-জামাতাকে যে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দু'একদিন যাইতে না যাইতে পিতা-মাতা দেখিলেন, কন্যার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। সে সর্বদা যেন কাহার চিন্তা করে। সকল কথায় কাজে তাহার অন্যমনস্কতা ধরা পড়ে।

মাতা একদিন কন্যাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "হাঁরে, আরিফকে চিঠি লিখব, আসতে?'

কন্যা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিল, 'না, মা, উনি ত শনিবারেই আসবেন!"

জামাই আসিল, তবু কন্যার চোখে মুখে পূর্বের মত সে দীপ্তি দেখা গেল না।

মাতা কন্যাকে বলিলেন, "সত্যি বল্ ত জোহরা তোর কি জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?"

জোহরা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "না মা! উনি ত আগের মতই আমায় ভালবাসেন। বাড়িতে আমার দু'টি খোকাকে ফেলে এসেছি, তাই মন কেমন করে।"

জোহরার মাতা আরিফের এই হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির রহস্য কিছু জানিতেন না। কন্যার যমজ সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে এবং ঐ বাড়ির প্রথা মত সেই সন্তান দু'টিকে বাড়িরই সম্মুখের মাঠে গোর দেওয়া হইয়াছে জানিতেন। মনে করিলেন, কন্যা তাহাদেরই স্মরণ করিয়া একথা বলিল। গোপনে অশ্রু মুছিয়া তিনি কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস চলিয়া গেল। জোহরাকে লইয়া যাইবার কেহ কোন কথা বলে না। জোহরার পিতা-মাতা অপেক্ষাও জোহরা বেশি ক্রুদ্ধ হইল। কি তাহার অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। স্বামী প্রতি শনিবার আসে, কিন্তু অভিমান করিয়াই সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না।

মাতা কিন্তু থাকিতে পারিলেন না। একদিন জামাতাকে বলিলেন, "বাবা। জোহরা ত একরকম খাওয়া-দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। ওর কি কোন রোগ বেরামই হল, তাও ত বুঝতে পারছিনে– দিন দিন শুকিয়ে মেয়ে যে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।"

www.nagorikpathagar.org

আরিফের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। বিষাক্ত সাপকে যে মানুষ এমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল জোহরা কি উন্মাদিনী? হঠাৎ তাহার মনে হইল, জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্প-তত্ত্ববিদ ছিলেন। ইহার মাঝে হয়ত সেই সাধনাই পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে।

ইহার মধ্যে সে বহুবার রসুলপুর গিয়াছে, কিন্তু সাপ দু'টিকে জোহরা চলিয়া যাইবার পর দুই একদিন ছাড়া আর দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সেই দুই এক দিনই তাহারা কি উৎপাতই না করিয়াছে! তাহা দেখিয়া বাড়ির কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে, উহারা জোহরাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে!

উদ্যত-ফণা আশী-বিষ! তবু সে কি তাহাদের কাতরতা মিনতি! একবার আরিফ, একবার তাহার পিতা–একবার তাহার মাতার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চায়, আর তাহারা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলায়।

আরিফ একথা বধূর কাছে প্রকাশ করে নাই, জোহরাও অভিমানভরে তাহাদের কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই।

জামাতা কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনরূপ ঔৎসুক্য-প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া জোহরার পিতা একদিন আরিফকে বলিলেন, 'বাবা, জান ত আমরা কত গরিব! মেয়ে ত শয্যা নিয়েছে! দেশে যা দুর্দিন পড়েছে, তাতে আমরা খেতেই পাচ্ছিনে, মেয়ের চিকিৎসা ত দূরের কথা! মেয়েটা এখানে থেকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তার চেয়ে তুমি কিছুদিনের জন্য ওকে কলিকাতায় বা বাড়িতে নিয়ে যাও। তারপর ভাল হলে ওকে আবার রেখে যেয়ো।" বলিতে বলিতে চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

স্থির হইল, আগামীকল্য সে প্রথমে জোহরাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে, সেখানে ডাক্তার দেখাইয়া একটু সুস্থ হইলে তাহাকে রসুলপুরে লইয়া যাইবে।

॥ ৩ ॥

রাত্রে আরিফের কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিতেই দেখিল, তাহার শিয়রে একজনকে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া এবং পার্শ্বের কামরায় আর একজন লোক– বোধ হয় স্ত্রীলোক। জোহরার বাক্স ভাঙ্গিয়া তাহার অলঙ্কার অপহরণ করিতেছে। ভয়ে সে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল; তাহার চীৎকার করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু ভয় পাইলেও তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। স্ত্রীলোক ডাকাত! সেই ঈষৎ চক্ষু খুলিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে এমন ভান করিয়া পড়িয়া থাকিল, যেন সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

www.nagorikpathagar.org

যে ঘরে সে ও জোহরা শয়ন করিয়াছিল তাহার পার্শ্বে আর একটি কামরা-স্বল্পায়তন। সেই কামরায় একটা স্টীলের ট্রাঙ্কে জোহরার গহনাপত্র থাকিত। প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা।

জোহরা বহু অনুনয় করিয়া আরিফকে ঐ গহনাপত্র রসুলপুরে রাখিয়া আসিবার জন্য বহুবার বলিয়াছে, আরিফ সে কথা কর্ণপাত করে নাই। সে বলিত, "তোমার কপালেই আজ আমাদের ঐ অর্থ অলংকার, ও কয়টা টাকার অলঙ্কার যদি চুরি যায় যাক্। আর তা ছাড়া তোমার বাবা এ অঞ্চলের পীর, ওঁর ঘরে কেউ চুরি করতে সাহস করবে না।"

আরিফ নিজের চক্ষুকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যখন দেখিল, ঐ মেয়ে ডাকাত আর কেহ নয় সে তাহার শাশুড়ি– জোহরার মাতা।

দুদিন আগে ঝড়ে ঘরের কতগুলো খড় উড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই অবকাশ পথে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্র-কিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। শাশুড়ি সমস্ত অলঙ্কারগুলি পোটলায় বাঁধিয়া চলিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার মুখে চন্দ্রের কিরণ পড়িল এবং সেই আলোকে আরিফ যাহার মুখ দেখিল, তাহাকে সে মাতার অপেক্ষাও ভক্তি করে। তাহার মুখে চোখে মনে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

এত কুৎসিত এ পৃথিবী!

সে আর উচ্চবাক্য করিল না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। সে দেখিল, তাহার শাশুড়ির পিছুপিছু তরবারিধারি ডাকাত বাহির হইয়া গেল। তাহারা উঠানে আসিয়া নামিতেই সে উঠিয়া বাতায়ন পথে দেখিতে পাইল, ঐ ডাকাত আর কেউ নয়– তাহারই শ্বশুর।

আরিফ জানিত, কিছুদিন ধরিয়া তাহার শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশেও প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। মাঝে মাঝে তাহার শ্বশুর ঘটি বাটি বাঁধা দিয়া অন্নের সংস্থান করিতেছিলেন, ইহাও সে আভাস পাইয়াছিল। ইহা বুঝিয়াই সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। জোহরার হাতে দিয়াও সে দেখিয়াছে, তাঁহারা জামাতার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে নারাজ।

হীনস্বাস্থ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিল, আরিফ তাহাকে জাগাইল না। ভয়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার আর ঘুম হইল না।

সকালের দিকে একটু ঘুমাইতেই কাহার ক্রন্দনে সে জাগিয়া উঠিল। তাহার শাশুড়ি তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, চোরে তাহাদের সর্বনাশ করিয়াছে।

www.nagorikpathagar.org

জোহরাও তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া বিস্ময়বিমূঢ়তার মত চাহিয়া রহিল।

আরিফের আর সহ্য হইল না। দিনের আলোকের সাথে তাহার ভয়ও কাটিয়া গিয়াছিল।

সে বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, 'আর কাঁদবেন না মা, ও অলঙ্কার কে চুরি করেছে তা আমি জানি, আমি ইচ্ছা করলে এখুনি তাদের ধরিয়ে দিতে পারি।"

বলা বাহুল্য, এক মুহূর্তে শাশুড়ির ক্রন্দন থামিয়া গেল। শ্বশুর-শাশুড়ি দুই জনে পরস্পরে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

আরিফ বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার শ্বশুর জামাতার হাত ধরিয়া বলিল, "কে বাবা সে চোর? দেখেছ? সত্যিই দেখেছ তাকে?"

আরিফ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "জি হাঁ দেখেছি! কলিকাল কিনা, তাই সব কিছু উল্টে গেছে! যার চুরি গেছে, তারি চোরের হাত চেপে ধরার কথা, এখন কিন্তু চোরই যার চুরি গেছে তার হাত চেপে ধরে!"

শ্বশুর যেন আহত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

আরিফ জোহরাকে ডাকিয়া রাত্রির সমস্ত ব্যাপার বলিল এবং ইঙ্গিতে ইহাও জানাইল যে, হয়ত এ ব্যাপারে তাহারও হাত আছে!

জোহরা মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল! তাহার মূর্ছা ভাঙ্গিবার পর আরিফ বলল, "সে এখনি এ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে! এ নরক-পুরীতে সে আর এক মুহূর্তও থাকিবে না।"

শ্বশুর-শাশুড়ি যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল; এমনকি জোহরার মূর্ছাও আরিফই ভাঙ্গাইল, পিতা-মাতা কেহ আসিয়া সাহায্য করিল না।

আরিফ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই তাহার পায়ে লুটাইয়া বলিল, আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে এখানে রেখে যেয়ো না। খোদা জানেন, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি কোন অপরাধ করিনি।"

আরিফ জোহরার কান্নাকাটিতে রাজি হইল তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে।

স্বামীর নির্দেশমত জোহরা পিতা-মাতাকে আর কিছুই প্রশ্ন করিল না।

॥ ৪ ॥

চলিয়া যাইবার সময় জোহরার পিতা-মাতা ছুটিয়া আসিয়া কন্যা-জামাতার হাতে ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল, তাহারা বাসিমুখে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে না। অন্তত সামান্য কিছু খাইয়া লইয়া তবে তাহারা যেন যায়।

www.nagorikpathagar.org

আরিফ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, এ বাড়ির বায়ুতেও যেন কিসের পূতিগন্ধ! তবু সে খাইয়া যাইতে রাজি হইল, সে আজ দেখিবে– মানুষের ভণ্ডামির সীমা কতদূর।

জোহরা যত জিদ্ করিতে লাগিল, সে এ বাড়িতে আর জলস্পর্শও করিবে না, আরিফ ততই জিদ্ ধরিল, না, সে খাইয়াই যাইবে।

জোহরা তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল, সে কিছু খাইল না। আরিফ কিন্তু খাইবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই বমির পর বমি করিতে লাগিল।

জোহরা আবার মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। সে মূর্ছার পূর্বে মায়ের দিকে তাকাইয়া একটি কথা বলিয়াছিল–'রাক্ষুসী'।

আরিফের বুঝিতে বাকি রহিল না সে কি খাইয়াছে!

কিন্তু এখানে থাকিয়া মারিলে চলিবে না। এই মৃত্যুর ইতিহাস সে তাহার পিতা-মাতাকে বলিয়া যাইবে। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশন অভিমুখে ছুটিল।

স্টেশনে পৌঁছিয়াই সে ভীষণ রক্ত-বমন করিতে লাগিল। রক্ত-বমন করিতে করিতেই সে প্রায় চলন্ত ট্রেনে গিয়ে উঠিয়া পড়িল।

ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। স্টেশন মাস্টার চীৎকার করিতে করিতে সে তখন ট্রেনে গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে।

কামরা হইতে একজন সাহেবী পোশাক-পরা বাঙালি চেঁচাইয়া উঠিলেন, "এটা ফার্স্ট ক্লাস, নেমে যাও, নেমে যাও।"

আরিফ কোন কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই রক্ত-বমন করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে যে বাঙালি সাহেবটি ট্রেনে যাইতেছিলেন, তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার।

আরিফ অস্ফুট স্বরে একবার মাত্র বলিল, "আমায় বিষ খাইয়েছে, আমার–"

বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেব মফঃস্বলের এক বড় জমিদার বাড়ির 'কলে' গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই ঔষধপত্রের বাক্স ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি 'সার্ভেন্ট' কামরা হইতে চাকরকে ডাকিয়া, তাহার সাহায্যে আরিফকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ইঞ্জেকশন দিলেন। দুই তিনটা ইঞ্জেকশন দিতেই রোগীকে অনেকটা সুস্থ মনে হইতে লাগিল। বমি বন্ধ হইয়া গেল।

ইচ্ছা করিয়াই ডাক্তার সাহেব গাড়ি থামান নাই। কারণ গাড়ি কলিকাতা পঁহুছিতে দেরি হইলে হয়ত এ হতভাগ্যকে আর বাঁচানো যাইবে না।

ট্রেন কলিকাতায় পঁহুছিলে, ডাক্তার সাহেব এ্যাম্বুলেন্স করিয়া আরিফকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

জোহরা সত্য সত্যই পয়মন্ত, আরিফ মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

এদিকে জোহরা চৈতন্য লাভ করিতেই যেই সে শুনিল, তাহার স্বামী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে উন্মাদিনীর মত ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পিতার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, তাহাকে এখনি তাহার শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হোক।

প্রতিবেশীরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

জোহরার পিতা-মাতা সকলকে বুঝাইলেন, কন্যার সমস্ত অলঙ্কার গত রাত্রে চুরি যাওয়ায় জামাতা পুলিশে খবর দিতে গিয়াছে, মেয়েও সেই শোকে প্রায় উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

পীর সাহেবের অভিশাপের ভয়ে লোকে বাড়িতে ভিড় করিতে পারিল না, কৌতূহল দমন করিয়া সরিয়া গেল।

॥ ৫ ॥

তিন দিন তিন রাত্রি যখন কন্যা জলস্পর্শও করিল না, তখন পিতা পাল্কি করিয়া কন্যাকে রসুলপুর পাঠাইয়া দিয়া পুণ্য করিবার মানসে মক্কা যাত্রা করিলেন।

আরিফও সেই দিন সকালে কলিকাতা হাসপাতাল হইতে মোটরযোগে বাড়ি ফিরিয়াছে।

আশ্চর্য! সে বাড়ি ফিরিয়া কিন্তু পিতা-মাতাকে কিছু বলিল না। এই তিন দিন ধরিয়া সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পিতা শুনিলে তাহাদের খুন করিতে ছুটিবেন। তাহারা ত মরিবেই, তাহার পিতাকেও সেই সাথে হারাইবে। জোহরাও আত্মহত্যা করিবে।

জোহরা! জোহরা! ঐ তিনটি অক্ষরে যেন বিশ্বের মধু সঞ্চিত। সে মৃত্যুকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দৈবকে ভিন্ন কাহাকেও সে দোষী করিবে না। বাহিরেও না, অন্তরেও না!

সে তখনও জানে না যে, সে আবার বাঁচিয়া ফিরিয়াছে। আর কাহাকে সে অপরাধী করিবে? তাহারা যে তাহারি প্রিয়তমার পরমাত্মীয়! বাঁচিয়া উঠিয়া সে যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। এ যেন তার আর এক জন্ম! মৃত্যুর স্পর্শ তাহাকে সোনা করিয়া দিয়াছে।

পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতামাতা চমকিয়া উঠিলেন, "এ কি, এমন নীল হয়ে গেছিস কেন? এ কি চেহারা হয়েছে তোর?"

www.nagorikpathagar.org

আরিফ শান্ত স্বরে বলিল, "কলেরা হয়েছিল, এসিয়াটিক কলেরা। বেঁচে এসেছি এই যথেষ্ট।"

পিতা-মাতা পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত দরিদ্রকে ডাকাইয়া দান-খয়রাত করিলেন। সন্ধ্যায় বাড়িতে মৌলুদ শরীফের ব্যবস্থা করিলেন।

তখনো সূর্য অস্ত যায় নাই, এমন সময় বাড়ির দ্বারে আসিয়া জোহরার পাল্কি থামিল।

জোহরা পাল্কি হইতে মৃত্যু পাণ্ডুর মুখে নামিতেই সম্মুখে আরিফকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "তুমি এসেছ– বেঁচে ফিরে এসেছ?"

বলিতে বলিতে সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। মূর্ছা ভাঙ্গিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আরিফের পিতা-মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তোরা দু'জনই কি মরতে মরতে ফিরে এলি?"

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, "আমার সোনার প্রতিমার কে এমন অবস্থা করলো?"

আরিফ জোহরাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

জোহরা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, 'না, না, তুমি শাস্তি দাও। তোমরা আমায় ঘৃণা কর, মার!"

আরিফ জোহরার অধর দংশন করিয়া বলিল, "এই নাও শাস্তি!"

॥ ৬ ॥

দুঃখ বিপদের এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও জোহরা তাহার পদ্ম-গোখরোর কথা ভুলে নাই। এতদিন সে তেমনি নীরবে তাহাদের কথা ভুলিয়া আছে, যেমন করিয়া সে তাহার মৃত খোকাদের ভুলিয়াছে! কিন্তু সে কি ভুলিয়া থাকা! এই নীরব অন্তর্দাহের বিষ-জ্বালা তাহাকে আজ মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত ঠেলিয়া আনিয়াছে। সে সর্বদা মনে করে, সে বেদেনী, সে সাপুড়ের মেয়ে! সে ঘুমে জাগরণে শুধু সর্পের স্বপ্ন দেখে। সে কল্পনা করে, তাহার স্বামী নাগলোকের অধীশ্বর, সে নাগমাতা, নাগ-রাজেশ্বরী!

বাড়িতে আসিয়া অবধি কাহাকেও পদ্ম-গোখরোর কথা জিজ্ঞাসা না করায়, শ্বশুর-শাশুড়ি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, বৌ ওদের কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে জোহরা স্বপ্নে দেখিতেছিল, তাহার মৃত খোকা দুইজন যেন আসিয়া বলিতেছে, "মাগো, বড় ক্ষিদে, কতদিন আমাদের দুধ দাওনি। আমরা

www.nagorikpathagar.org

কবরে শুয়ে আছি, আর উঠতে পারিনে! একটু দুধ! মা! একটু দুধ! বড় ক্ষিদে!" 'খোকা' 'খোকা' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া জোহরা জাগিয়া উঠিল। দেখিল, স্বামী ঘুমাইতেছে। প্রদীপ জ্বালিয়া কি যেন অন্বেষণ করিল, কেহ কোথাও নাই।

সে আজ উন্মাদিনী! সে আজ শোকাতুরা মা, সে পুত্রহারা জননী। তাহার হারা-খোকা ডাক দিয়াছে, তাহারা ছয় মাস না খাইয়া আছে!

পাগলের মত সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ির সম্মুখেই মীর পরিবারের গোরস্থান। ক্ষীণ শিখা প্রদীপ লইয়া উন্মাদিনী মাতা দুইটি ছোট কবরের পার্শ্বে আসিয়া থামিল। পাশাপাশি দুইটি ছোট কবর, যেন দু'টি যমজ ভাই– গলাগলি করিয়া শুইয়া আছে।

শিয়রে দুইটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ, জোহরাই সহস্তে রোপণ করিয়াছিল। এইবার তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। রক্তবর্ণের ফুলে ফুলে কবর দুইটি ছাইয়া গিয়াছে।

মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'খোকা! খোকা! কে তোদের এত ফুল দিয়াছে বাবা! খোকা!"

মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, না ঐ কবর ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল– জানে না, জাগিয়া উঠিয়াই জোহরা দেখিল, তাঁহার বুকে কুণ্ডলী পাকাইয়া সেই পদ্ম-গোখরো-যুগল।

জোহরা উন্মত্তের মত চিৎকার করিয়া উঠিল, "খোকা, আমার খোকা, তোরা এসেছিস, তোদের মাকে মনে পড়লো?" জোহরা আবেগে সাপ দুইটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, সর্প দুইটিও মালার মত তাহার কণ্ঠ বাহু জড়াইয়া ধরিল।

তখন ভোর হইয়া গিয়াছে।

জোহরা দেখিল পদ্ম-গোখরোদ্বয়ের সেই দুগ্ধ-ধবল কান্তি আর নাই, কেমন যেন শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহারা বারেবারে জিভ বাহির করিয়া যেন তাহাদের তৃষ্ণার কথা, ক্ষুধার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে– মা গো বড় ক্ষিদে! তুমি ত ছিলে না, কে খেতে দেবে? একটু দুধ! বড় ক্ষিদে মা, বড় ক্ষিদে!

জোহরা তাহাদের বুকে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তখনো কেহ জাগিয়া উঠে নাই।

সে হেঁসেলে ঢুকিয়া দেখিল, কড়া-ভরা দুগ্ধ। বাটিতে করিয়া দিতেই সাপ দুইটি বুভুক্ষের মত বাটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। যেন কত যুগযুগান্তরের ক্ষুধাতুর ওরা!

জোহরার দুই চক্ষু দিয়া তখন অশ্রুর বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।

শাশুড়ি উঠিয়া বধূর কীর্তি দেখিয়া মূক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; বধূ

www.nagorikpathagar.org

তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, কি হবে, এ বালাইরা এ ছয় মাস কোথায় ছিল? যেমনি তুমি এসেছ, আর অমনি গায়ের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে।"

জোহরা আহত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ষাট, ওরা বালাই হবে কেন মা? ওরা যে আমার খোকা।"

শাশুড়ি বুঝিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, "সত্যিই ওরা তোমার খোকা বৌমা। তুমি চলে যাবার পর আমরা দু'একদিন ওদের দুধ দিয়েছিলাম। ওমা শুনলে অবাক হবে, ওরা দুধ ছুঁলেই না। চলে গেল। সাপও মানুষ চেনে! কলিকালে আরও কত কি দেখব!"

সাপ দুইটি তখন বোধ হয় অতিরিক্ত দুগ্ধপানবশতঃই নির্জীবের মত বধূর পায়ের কাছে শুইয়া পড়িয়াছিল।

॥ ৭ ॥

সেইদিন সন্ধ্যা-রাত্রিতে বাড়ির একজন দাসী চিৎকার করিয়া উঠিল, "ও মা গো, ভূতে ধরলে গো! জিনের বাদশা গো! জিন ভূত!"

বলিয়াই সে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বাড়িময় ভীষণ হৈচৈ পড়িয়া গেল।

আরিফের মাতা তখন আরিফকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, "হাঁ রে, বৌমা যে আবার পোয়াতি, তা ত বলিস নি। ওর যে ব্যথা উঠেছে।"

আরিফ বলিতেছিল, "কিন্তু এখন ত ব্যথা ওঠার কথা নয় মা, মোটে ত সাত মাস।"

এমন সময় বাড়িময় শোরগোল উঠিল, "ভূত! ভূত! য়্যাদ্দাড়িওয়ালা ভূত!"

বাড়ির চাকর-চাকরানী সকলে বলিল, তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে– জ্যান্ত ভূত! আকাশে গিয়া তাহার মাথা ঠেকিয়াছে! বাড়ির মধ্যে আমগাছ-তলায় দাঁড়াইয়া আছে!

আরিফ, আরিফের মাতা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যই ত কে যেন গাছ তলায় প্রেতমূর্তির মত দাঁড়াইয়া!

তাঁহাদের পিছনে পিছনে যে ভূত দেখিতে জোহরাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহা কেহ দেখে নাই।

হঠাৎ ভূত চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাপরে, সাপে খেলে রে।"

জোহরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা তুমি।" আরিফের মাতাও বলিয়া উঠিল, 'য়্যাঁ, বেয়াই?"

www.nagorikpathagar.org

জোহরা তখন চিৎকার করিতেছে, "ও সত্যই ভূত। বাবা নয়, বাবা নয়, ও ভূত! ওকে মার! মেরে বের করে দাও।"

হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, ভূত যেন যষ্টিদ্বারা নির্দয়ভাবে কাহাকে প্রহার করিতে করিতে চিৎকার করিতেছে– "ওরে বাপরে সাপে খেয়ে ফেললে। আমায় সাপে খেয়ে ফেললে!"

জোহরা উন্মাদিনীর মত তাহার শাশুড়ির হাতের লণ্ঠন কাড়িয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল– ওগো আমার খোকাদের মেরে ফেললে! ওকে ধর! ওকে ধর!"

জোহরার সাথে সাথে সকলে আমগাছ-তলায় গিয়া দেখিল, ভূত সত্যই আর কেহ নয়, সে জোহরার পিতা। তাহাকে তাহাদের বাস্তু সাপ পদ্ম-গোখরোদ্বয় নির্মমভাবে দংশন করিতেছে এবং ততোধিক নির্মমভাবে সে সর্পদ্বয়কে প্রহার করিতেছে।

জোহরা একবার "খোকা" এবং একবার "বাবা" বলিয়াই মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে জোহরা আরিফকে ডাকিল। সকলে সরিয়া গেলে, সে জিজ্ঞাসা করিল। "আমার খোকারা কই? আমার পদ্ম-গোখরো? আমার বাবা?"

আরিফ কাঁদিয়া বলিল, "জোহরা! জোহরা! কেউ নেই! সব গেছে! সকলে গেছে! তোমার বাবা মেরেছেন পদ্ম-গোখরোর কামড়ে।"

"তোমার মা মারা গেছেন কলেরা হয়ে। ওঁরা মক্কা যাচ্ছিলেন। তোমার মা রাস্তায় মারা গেলে, তোমার বাবা অনুতপ্ত হয়ে তোমায় শেষ দেখা দেখতে আসেন লুকিয়ে। লুকিয়েই হয়ত তোমায় দেখে চলে যেতেন। এমন সময় চাকরানী দেখতে পেয়ে ভূত বলে চিৎকার করে। ঠিক সেই সময় তোমার পদ্ম-গোখরো তাঁকে তাড়া করে।"

জোহরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বেশ হয়েছে, জাহান্নামে গেছে ওরা। যাক। আমার পদ্ম-গোখরো আমার খোকারা কোথায় বল।"

আরিফ বলিল, "তোমার বাবা তাদের মেরে ফেলেছেন!"

জোহরা, "এ্যাঁ খোকারা নাই?" বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।

www.nagorikpathagar.org

ঈদের দিনে

আজ ঈদ! মদিনার ঘরে ঘরে আনন্দ উল্লাস, মাঠে মাঠে কোলাহল। নানা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আতর গোলাপের খোশবু হাওয়ায় ছড়াইতে ছড়াইতে দলে দলে লোক 'ঈদগাহে' যাত্রা করিয়াছে। বালকেরাও তেমনিই সজ্জিতভাবে পশ্চাতে ছুটিয়াছে।

ঈদের নামাজ হইয়া গেল। বালকেরা দল বাঁধিয়া আনন্দের সহিত নানা খেলায় মত্ত হইল। মহানবী মোহাম্মদ (দ.) বাড়ি ফিরিতেছিলেন; দেখিলেন, মলিন বসন-পরা একটি বালক মাঠের এক প্রান্তে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছে!

হযরত ধীরে ধীরে বালকটির নিকট গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদিতেছ কেন বাছা?" বালক ক্রোধে হজরতের হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "ছেড়ে দাও আমাকে!" মহানবী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পুনরায় বলিলেন, "একটু বল না বাবা, শুনি তোমার কি হইয়াছে।" বালক হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিতে লাগিল– "হযরত মোহাম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া আমার বাবা মারা গিয়াছেন, বিষয়-আশয় অন্য লোকে কাড়িয়া লইয়াছে। এরা আজ কত সুন্দর সুন্দর কাপড় পরিয়া আনন্দে লাফালাফি করিতেছে, আর আমার না আছে থাকিবার জায়গা, না আছে পরণের কাপড়, না আছে পেটে ভাত!"

মহানবীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল; তবুও তিনি হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "বাঃ তাতে কি? আমারও তো পিতা-মাতা ছোট সময় মারা গিয়াছেন।"

এবার বালক মুখ তুলিয়া হযরতের মুখের দিকে তাকাইল এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বিশেষ লজ্জিত হইল।

হযরত কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা, যদি আমি তোমার পিতা হই, আয়েশা তোমার মাতা হন, আর ফাতেমা তোমার বোন হয়; ইহাতে তুমি সুখী হইতে পারিবে?" বালক মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

মহানবী বালকের হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ি লইয়া গেলেন এবং বিবি আয়েশাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই নাও তোমার জন্য একটি ছেলে আনিয়াছি।"

আয়েশা নিজ হাতে বালককে গোসল করাইয়া দিয়া পরম পরিতোষের সঙ্গে খাওয়ালেন এবং সুন্দর পোশাক পরাইয়া বলিলেন, "যাও, এখন আর আর-বালকদের সঙ্গে একবার খেলা করিতে যাও।" বালক লাফাইতে লাফাইতে গিয়া খেলায় যোগ দিল।

www.nagorikpathagar.org

চাদর

পাড়া গাঁয়ের গরীব মুসলমানদের মধ্যে একজন মোড়ল ছিলেন। তাঁকে সকলে ফকীরজী বলে ডাকত। তিনি দিনরাত আল্লা নাম জিকির করতেন। তাঁর গায়ে সর্বদা থাকত একটি চাদর। সেই চাদরে লেখা ছিল কোরান শরীফের অনেকগুলো বিখ্যাত 'সুরা' (শ্লোক)। সেটিকে তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন। সেই চাদর গায়ে দিয়ে গ্রামের লোকদের অনেক মা'জেজা (বিভূতি) দেখাতেন, রোগ ভাল করতেন, তাদের মাঠে বেশি ফসল ফলাতেন, ইত্যাদি। আর এক গ্রামের মোড়ল তাই দেখে মনে করল– ঐ মোড়লের যা কিছু শক্তি, ঐ চাদরের গুণে। ওকে যে গ্রামের– এবং পাশের অনেক গ্রামের লোকেরা শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, দাওত্ (নিমন্ত্রণ) করে খাওয়ায় তার কারণ ঐ চাদরের শক্তি। ঐ চাদর কেড়ে নিয়ে গায়ে দিলেই আমাকেও সকলে সম্মান দেবে, শ্রদ্ধা করবে, পীর বলে মানবে! এই ভেবে একদিন সে হাত জোড় করে সেই ফকীরকে নিমন্ত্রণ করে এল রাত্রে খাওয়ার জন্য। সন্ধ্যায় সেই ফকীর এসে হাজির হলেন অন্য গ্রামের মোড়লের বাড়িতে! তখন সে তার দলবল নিয়ে রাম-দা দেখিয়ে বলল, 'তুমি যদি তোমার গায়ের ঐ চাদর আমাকে না দাও, তা হলে তোমাকে কোতল করব।' বেচারা ফকীর ওর রক্ত-চক্ষু আর রাম-দা দেখে গায়ের চাদর দিয়ে পালিয়ে এল।

ও-গাঁয়ের মোড়ল চাদর গায়ে দিয়ে সগর্বে পাড়া বেরিয়ে এল। আড়-চোখে দেখতে লাগল কেউ চেয়ে দেখে কিনা। কেউ এসে সালাম করে কিনা। কেউ জিজ্ঞাসাও করল না, 'মোড়ল! খবর সব ভাল ত?' মোড়ল হতাশ হ'ল না! মনে করল দু'চার দিন গায়ে দিতে দিতে এর শক্তি বেরিয়ে পড়বে। দিন পনেরো, ক্রমে ক্রমে এক মাস গায়ে দিয়েও কোন শক্তি পেয়েছে বলে মনে হ'ল না। গ্রামের লোক হাসে আর বলে, মোড়লের মাথা খারাপ হয়েছে।

এদিকে ফকীর চাদর হারিয়ে হতাশ হ'য়ে পড়লেন। চাদরের শোকে কাঁদতে লাগলেন। এই চাদর তিনি মক্কা-মদিনা ফেরত এক হাজীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। একদিন ফকীরজী আর থাকতে না পেরে নদীর ধারে সারা রাত্রি জেগে জিকির করেন আর কাঁদেন। ভোরের সময় এক ফেরেশতা (দেবদূত) এসে বলল, 'তোমার কোন ভয় নাই, তোমার চাদর তুমি ফিরে পাবে। ও-গাঁয়ের মোড়ল চাদর গায়ে দিয়ে কোন শক্তি পায়নি। সে তো আল্লাহকে ডাকে না। ধৈর্য্য ধর, আর কিছু দিন গায়ে দিয়ে ও তোমার চাদর আবার ফিরিয়ে দেবে।'

ফকীর আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

www.nagorikpathagar.org

মরা কাউয়া

এক ছিলেন পণ্ডিত। তিনি অনেক দিন সংসার করে বৃদ্ধ বয়সে দিন-রাত বইপত্তর নিয়ে নাক টিপে চোখ বুজে যোগ অভ্যাস করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী দেখলেন, এই অবস্থায় আর কিছুদিন চললে সংসার চলবে না; উপোস করে মরতে হবে। ব্রাহ্মণী ধ্যানস্থ পণ্ডিতের সামনে শূন্য চালের হাঁড়ি ভেঙে বলতে লাগলেন– 'এই চোখ বুজে টিকি উঁচিয়ে বসে থাকলে ছেলেমেয়েরা খাবে কী? বাড়িতে সাত দিনের চাল আছে। এই সাত দিনের মধ্যে চাল-ডালের টাকা না পেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। এই সব ভণ্ডামী করে কি টাকা পাওয়া যায়?' ব্রাহ্মণ তেরিয়া হয়ে বললেন, 'কি? এ সব ভণ্ডামী? তুমি আমার যোগের শক্তি দেখবে? আমি সাত দিনের মধ্যে সাত হাজার টাকা এনে দেব।' ব্রাহ্মণী বললেন, 'ভীমরতি হয়েছে! চল্লিশ বছরে এক সাথে এক হাজার টাকা পারলেন না সাত দিনে সাত হাজার টাকা দেবেন!' ব্রাহ্মণ বললেন, দেখে নিও।' পণ্ডিতের গোটা বিশেক লুকানো টাকা ছিল তাই আর গাড়ু-গামছা নিয়ে পণ্ডিত বেরিয়ে পড়লেন। শহরে গিয়ে দু-একজন ধূর্ত লোক যোগাড় করে বিজ্ঞাপন দিলেন, এক মহাযোগী ব্রাহ্মণ এসেছেন হিমালয় থেকে, তাঁর কাছে একটা মরা মানুষের মাথার খুলি আছে, সেই মাথার খুলিকে যে যা জিজ্ঞাসা করে সে তার সঠিক উত্তর দেয়! শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল বেশি কথা, কম কথা অনুসারে এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে দিতে হবে। সন্ধ্যা হতেই দলে দলে লোক এসে হাজির হল। ব্রাহ্মণ একসঙ্গে সব লোককে আসতে দিলেন না। একটা পর্দা টাঙিয়ে একটি একটি করে লোক আসতে দিলেন। প্রথমে যে লোকটি এল সে দশটি প্রশ্ন করতে চাইল। ব্রাহ্মণ পাঁচ টাকা চার্জ করলেন। ব্রাহ্মণের হাতে টাকা দিয়ে সে বলল, 'মরা মানুষের মাথার খুলি কই'? ব্রাহ্মণ একটা ঝুড়ি তুলে বললেন, 'এই!' সে রেগে উঠে বললে, 'এ যে মরা কাউয়া, খুলি কই!' ব্রাহ্মণ কেঁদে ফেলে বললেন, 'খুলি-টুলি মিথ্যা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ছেলেপিলে খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে– তুমি এ কথা কাউকে বলো না, বললে তোমাকে সবাই হাঁদা, বোকা কত কি বলবে। মনে কর দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করলে। তোমার মঙ্গল হবে বাবা, মঙ্গল হবে।' সে লোকটি আর একবার মরা কাকের দিকে করুণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে বাইরে বেরিয়ে গেল! বাইরে বেরিয়েই হেসে ফেলল। লোকটি ছিল কায়স্থ। যত লোক তাকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'খুলি কি সত্যই কথা কয়?' সে উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল, তখন ও নিশ্চয় কেল্লা ফতে করেছে। ভিড়ের লোক ঠেলাঠেলি করে কে আগে যাবে, তার চেষ্টা করতে লাগল। যে যায় ব্রাহ্মণ তাকে ঐ এক কথাই বলে– আগে টাকা নিয়ে। কেউ কথা বলল না, পাছে অন্য লোক তাকে বোকা বলে। এক রাত্রেই ব্রাহ্মণের সাত হাজার টাকা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ তল্পি-তল্পা গুটিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়ল। ব্রাহ্মণীকে ডেকে সগর্বে বলল, 'এই নে সাত হাজার টাকা। আর আমায় কিছু বলিস নে। আমি লঙ্কা বিজয় করে এসেছি।' ব্রাহ্মণী বদন-ব্যাদান করে এক হাত জিভ বের করে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

www.nagorikpathagar.org

ভূতের ভয়

প্রথম দৃশ্য

[স্থান–দেবলোক। দেবাধিপতি, দেবকুমারগণ ও দেবকন্যাগণের আহূত সভা-মণ্ডল]

(দেবকুমার ও দেবকন্যাগণের গান)

জাগো জাগো দেব-লোক।
এলো স্বর্গে কি মৃত্যুর ভয় দুখ-শোক ॥

সাত সাগরের গড়খাই পার হয়ে ঐ
এসে পিশাচ প্রেতের দল নাচে থৈ থৈ,
জাগো সুর-ধীর দেব-বালা মাভৈ মাভৈ;
নব মন্ত্র-পূত নব-জাগরণ হোক ॥

ওরা আনিয়াছে পাতালের ভীতি মারিভয়,
মোরা ভয়ে উঠি শুধু পরাজিত, শক্তিতে নয়।
ওঠো ওঠো বীর উন্নত-শির দুর্জয়,
ভেদি কুয়াশা মায়ার,
আনো আশার আলোক ॥

দেবাধিপতি — মাভৈঃ! মাভৈঃ বন্ধুগণ, আমরা এতদিনে আমাদের মন্ত্রের সন্ধান পেয়েছি। সে মারণে-মন্ত্র নয়– মরণ-মন্ত্র। আমরা– দেবলোকবাসী এতদিন নিজেদের অমর মনে করে জীবনকে অবহেলা করেছি। অমৃতকে পচিয়ে মদ করে তারি নেশায় যখন বুঁদ হয়ে গেছি, তখনই এসেছে সাগর-পারের নির্বাসিত অভিশপ্ত প্রেতপিশাচের দল। তারা আমাদের প্রমত্ততার– জড়তার অবকাশে আমাদের অমৃত, কবচ, শক্তি সব কিছু অপহরণ করেছে। আজ বিশ্ববাঞ্ছিত দেবলোক নিরামৃত নির্জীব, নিষ্প্রাণ, শক্তিহীন। আমাদেরই পাপে আজ তারা মৃত্যুঞ্জয়ের প্রসাদ হতে বঞ্চিত সত্য, –আজ আমাদের তপস্যার শক্তি অপহরণ করে প্রেতের দল শক্তিমান সত্য, –তবু আজ একমাত্র

www.nagorikpathagar.org

আশা আমরা আমাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি। আমাদের হস্তপদের অশেষ বন্ধনের দারুণ পীড়া অনুভব করবার চেতনা ফিরে পেয়েছি।

সমবেত কণ্ঠে সাধু! সাধু!

দেবাধিপতি : আমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যা-স্থানীয় দেবকুমার ও দেবকন্যাগণ! তোমাদের এক শতাব্দী পূর্বে আমার জন্ম, আর আমাদেরই পাপে তোমরা আজ প্রেতের মায়ায় বন্ধ-কারারুদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা করছি– দেবলোকে জরা-মৃত্যুর, দুঃখ-তাপের বলি হয়ে। তোমরা নিষ্পাপ, তোমাদের পিতৃ-পিতামহের পাপে তোমরা আজ প্রেতাধীন। আমরা ভূতাধীন–অতীতের দাস, তোমরা বর্তমান শতাব্দীর নবজাত শিশু। তোমরা অতীতের দাসকে– ভূতের অধীনকে মুক্ত কর। পদাঘাতে পতিত কর ভূতকে– অতীতকে, দক্ষিণ করে কর মিলিয়ে টেনে তোল ভবিষ্যৎকে।

সমবেত কণ্ঠে সাধু! সাধু! জয় দেবাধিপতির জয়!! অমর দেবলোকের জয়!!

দেবাধিপতি দেবলোকের জয়ধ্বনি কর, দেবাধিপতির নয়। আমি অতীতের লজ্জা, ভূতের লাঞ্ছনা আমায় অপবিত্র করেছে!

দেবসঙ্ঘের একজন: না। না। আপনি তার ব্যতিক্রম। সত্য, আপনি জরায় ন্যুব্জ কিন্তু ঐ ন্যুব্জ। দেহই অতীত হতে বর্তমানে আসার সেতু।

সমবেত জয়ধ্বনি : সাধু! সাধু! বেশ বলেছ ভাই! বেঁচে থাক!

দেবাধিপতি : তোমাদের এই শ্রদ্ধাই আমার সকল কলঙ্ক, সকল লজ্জাকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। তাই আজ আমি তোমাদের মাঝে দাঁড়াবার দুঃসাহস অর্জন করেছি। আমি বলছিলাম–আমরা আমাদের ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান পেয়েছি। সে অস্ত্র ধাতু দিয়ে তৈরি নয়, সে অস্ত্র বাণীর। সে অস্ত্রের নাম 'মাভৈঃ'!

সকলে : মাভৈঃ মাভৈঃ!

দেবাধিপতি : হাঁ, ঐ মন্ত্র উচ্চারণ কর সকলে। মাভৈঃ! মাভৈঃ! ভয়

www.nagorikpathagar.org

নাই! ভয় নাই! শুধু এই বাণীর আশ্বাসে–এই মন্ত্রের জোরেই আমরা অভিশপ্ত-আত্মা ভূতের দলকে আবার সাগর-পারে তাড়িয়ে রেখে আসব।

সকলে — মাভৈঃ! জয় দেবলোকের জয়!

জনৈক দেবযুবা — শুধু বাণীর আশ্বাসে আমরা বিশ্বাসী নই দেবাধিপতি : আমরা বলি 'এহ বাহ্য!'

সমবেত দেবসঙ্ঘ : — বসে পড়ো! বসিয়ে দাও!

দেবাধিপতি : — (দক্ষিণ কর উত্তোলন করিয়া সকলকে শান্ত হইবার ইঙ্গিত করিলে। দেবসঙ্ঘ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শান্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিল) কে তুমি উদ্ধত যুবক? তোমাকে এই নিপীড়িত দেবপুরীর কোনো যজ্ঞে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

দেবযুবা — আমরা থাকি আমাদের যজ্ঞের গোপনতম অন্তরালে, দেবাধিপতি! আমরা আপনার যজ্ঞের মন্ত্র-পাসক নই– আমরা যজ্ঞের অগ্নি-পূজারী! আমরা যজ্ঞের আহুতি হয়ে আত্মবলি দিই, আর সেই আহুতিই হয়ে ওঠে লেলিহান অগ্নিশিখা। আমরা নিপীড়িত দেব-আত্মার দাহিক্য-শক্তি।

দেবাধিপতি : — চিনেছি তোমায়। তুমি বিপ্লব-কুমার! বীর! আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ কর। তোমাদের প্রাণকে– তোমাদের দুর্দৈব বিলাসিতাকে আমি শতবার প্রণাম করেছি– কিন্তু তোমাদের এই পথকে মুক্তির শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলে গ্রহণ করতে পারিনি। আমি ভূতগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, –জানি। তবু বলি– সৈনিকের দুর্ধর্ষতাই একমাত্র গুণ নয়। দুর্ধর্ষতা সৈনিককে করে শুধু সৈনিক, ধৈর্যই করে তাকে মহান।

বিপ্লব-কুমার — আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন দেবাধিপতি! আপনাকে আমরা পূজা করি দেবতার অন্তরের রাজাধিরাজ বলে, কিন্তু আপনাকে কিছুতেই মনে করতে পারিনে– আপনি আমাদের যুযুৎসু সেনাদলের অধিনায়ক।

দেবসঙ্ঘ — বসিয়ে দাও! বসিয়ে দাও! উন্মাদ! উন্মাদ।

বিপ্লব-কুমার — হাঁ বন্ধু, আমরা সত্যসত্যই উন্মাদ। আমাদের উন্মাদনার গান শুনবে?

www.nagorikpathagar.org

দেবসঙ্ঘের কয়েকজন : এই রে! সর্বনাশ করলে এই পাগলাচণ্ডী! এইবার ধরলে বুঝি ভূতে!

[বিপ্লব-কুমারের গান]

মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাব
মন্ত্র দিয়ে নয়।
মোরা জীবন ভরে মার খেয়েছি
আর প্রাণে না সয়॥
তোদের পিঠ হয়েছে বায়োয়ারি ঢাক
যে চায় হানে মার,
সেই ঢাক গড়িয়ে মারের পিঠে
পড়ুক না এবার!
তোরা নবীন মন্ত্র শোন আমাদের–
'প্রহার ধনঞ্জয়!!'

দেবসঙ্ঘ : সাধু! সাধু! 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'! জোর বলেছ দাদা! বেঁচে থাক!

আছে তোদের গায়ে ভূতের লেখা
হাজার মারের ঋণ,
এবার ফিরিয়ে দিতে হবে সে মার
এসেছে আজ দিন।
ওরে মন্ত্র দিয়ে হয় কি কভু
বনের পশু জয়॥
খর স্রোতের মুখে খড় ভেসে কয়–
'সাগর-অভিযান!'
তোরা যজ্ঞ করিস অযোগ্য সব
প্রাণে মৃত্যুভয়!
তোদের হাড্ডি গেছে মাংস গেছে
চামড়া মাত্র সার,
তোরা তাই নিয়ে কি ভাবিস তোরা
যজ্ঞ অবতার।
তোদের শুষ্ক দেহে জ্বালা এবার
আগুন জ্বালাময়॥

www.nagorikpathagar.org

দেব-যুবাগণ : জয় বিপ্লব-কুমারের জয়!

সকলের গান–

মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাব

'মন্ত্র দিয়ে নয়!

দেবাধিপতি : আমি কি তা হলে বুঝব.. এই তোমাদের ঈপ্সিত পথ? বন্ধুগণ! তা হলে আমায় বিদায় দাও। আমি জানি–ও-পথ মৃত্যুর পথ, জীবন জয়ের পথ নয়। মৃত্যু তো আমরা ভূতের হাত দিয়েই নিত্য-নিয়ত পাচ্ছি ওর জন্য নতুন আয়োজনের তো কোনো দরকার নেই। আমরা চাই জীবন এবং জীবন লাভ করতে হলে চাই,–তপস্যা! যুদ্ধ নয়! তা ছাড়া, যুদ্ধ করবে কার সাথে? এ মায়াবী ভূতের দল তো সামনে থেকে দিনের আলোকে যুদ্ধ করে না। এরা যুদ্ধ করে অপ্রকারের আড়ালে থেকে–অন্তরীক্ষে থেকে–পাতালতলে থেকে। শূন্যের সাথে যুদ্ধ করি কি দিয়ে? এরা শাসন করছে ভয় দিয়ে–অস্ত্র দিয়ে তো নয়। অস্ত্রধারীর বিপক্ষে অস্ত্র ধরা যায়–কিন্তু ভয় দেখানো ভূতের উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে হলে মাভৈঃ বাণীর ভরসা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

[এমন সময় সভা-মণ্ডপে ভীষণ আর্ত বর উঠিল। সভার সকলে যে যেদিকে পারিল– ভয়ে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। চতুর্দিকে 'ভূত–ভূত' রব উঠিতে লাগিল। ভূতদের কাহাকেও দেখা গেল না। কেবল অন্তরীক্ষে কিসের ভীষণ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। সভার সমস্ত আলোক একসঙ্গে নিভিয়া গেল। মনে হইল, অসংখ্য কায়াহীন ছায়া বীভৎস মূর্তিতে সভা-মণ্ডপ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বিপ্লব-কুমার ও দেবাধিপতি ব্যতীত সভামণ্ডপে আর কাহাকেও দেখা গেল না।]

বিপ্লব-কুমার : দেবাধিপতি ! এই কাপুরুষদের দল কি আপনার মন্ত্রশিষ্য?

দেবাধিপতি : (হাসিয়া) এরাই কি তোমার যুদ্ধ-সেনা? জানি বন্ধু, আমাদের দেবজাতির ক্লীবতা নির্লজ্জতার কত অতলতলে গিয়ে পড়েছে, তাই আমি বলি– এ জাতিকে দিয়ে যুদ্ধজয়ের কল্পনা একেবারে অসম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লব-কুমার : এই অসম্ভবের সম্ভাবনার আশাতে আমি ভবিষ্যৎ-কালের প্রতীক– যৌবনের প্রতীক পথে বেরিয়েছি, দেবাধিপতি! আমার জীবনে তারি শেষ ফলাফল দেখতে পাই। কিন্তু–এ কি! আমিও কি ভূতের মায়ায় আবদ্ধ? আমি আর নড়তে পারছিনে কেন?

দেবাধিপতি : বন্ধু ! আমরা অনেক আগেই ভূতের মায়ায় বন্ধি হয়েছি। আমাদের দুই জনেরই এখন এক গতি। আমাদের জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ আজ এক সাথে বন্দি হয়ে পাতাল-পুরীর অন্ধকার আশ্রয় করে পড়ে থাকবে।

বিপ্লব-কুমার : আপনার মন্ত্র হয়তো বাধাকে বাধা না দিয়ে জয় করা কিন্তু আমি সে মন্ত্রের উপাসক নই, দেবাধিপতি। আমি এ বন্ধন ছিন্ন করব। (বংশী বাদন ও সঙ্গে সঙ্গে সহস্র রক্ত-বেশ পরিহিত দেব-যুবার প্রবেশ। তাহারা আসিয়াই ঝড়ের বেগে বিপ্লব-কুমারকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। চতুর্দিকে ভূতের অবোধ্য ভাষায় ভীষণ কিচির-মিচির শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ রক্ত-আলোকে দেখা গেল– বাঁদর ভল্লুক, শৃগাল, কুকুর, শার্দুল, হায়েনা, খাটাস প্রভৃতি নানা মুখের নানা বীভৎস ভূতের দল দেবাধিপতিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেবাধিপতি প্রসন্ন হাসিমুখে তাহাদের অনুগমন করিতেছেন। সহসা নানাপ্রকার রথে আরো নানা মুখের ভূতের দল আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই তাহারা দিকে দিকে রথ লইয়া বিপ্লব-কুমারের দলকে ধরিতে বাহির হইয়া গেল। ভূতের মুখে নাকি-সুরে শুধু এক শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল–বিপ্লব-কুমার! বিপ্লব-কুমার)!

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দেবলোক। ভূত-নিবারিণী সভার সভ্যগণ তাঁহাদের নব-নির্বাচিত সভাপতি জয়ন্তের প্রাসাদে কথোপকথন করিতেছেন।]

জয়ন্ত : আমি বলি কি, আমাদের বন্দি নেতা দেবাধিপতির নির্বাচিত পথই আমাদের বর্তমান অবস্থায় প্রকৃষ্ট পথ। অবশ্য অধিকাংশ সভ্যের মত হলে আমরা এর চেয়েও এক ধাপ উপরে উঠবার চেষ্টা করতে পারি।

জনৈক সভ্য : আমরা দেবলোকে এতদিন শুধু মাভৈঃ-বাণীর মন্ত্রই প্রচার করেছি। তাতে কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। ভূতের ভয় দেবলোক

হতে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত না হলেও তাদের বিরুদ্ধে যে বিরাট

অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে–তাতেই আমাদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হবে এই অসন্তোষের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে শোষণ-শুষ্ক দেবলোক!!

দ্বিতীয় সভ্য : আমিও বলি, আমরা তো হাতে মারতে পারব না ওদেরে। এখন ভাতে মারতে পারি কি-না তারই আয়োজন করতে হবে।

তৃতীয় সভ্য : কিন্তু এ ভূত যে আমাদের অন্নের চেয়ে রক্তই শোষণ করে বেশি। ঐ রক্ত-খেকো ভূতকে ভাতে মেরে বিশেষ সুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না।

দ্বিতীয় সভ্য : ভাতে মারা মানেই ওদের প্রাণ আমাদের রক্ত শোষণে বাধা দেওয়া। তাহলেই ওদের আয়ু যাবে কমে। আমিও বলি যুদ্ধ করে ওদের কাটব কি, ওরা যে কন্দকাটা ভূত। ওদের রক্তপাত করলেই ওরা হয়ে উঠবে আরো ভীষণ, ছিন্নমস্তার মতো নিজের রক্ত নিজে পান করে উন্মাদ নৃত্য শুরু করে দেবে।

জয়ন্ত : ও কার আলোচনায় এখন প্রয়োজন নেই। রক্তারক্তির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। আমাদের এ অহিংস যুদ্ধ। আমরা দলে দলে ধরা দিয়ে ওদের পাতালপুরীর সমস্ত রন্ধ্র বন্ধ

www.nagorikpathagar.org

করে দেব। যে অন্ধ-কারার ভয় দেখিয়ে ওরা আমাদের নির্বীর্য করে রেখেছে, সেই ভয়টাকেই আগে নিঃশেষ করে ফেলতে হবে। মারবে কতক্ষণ? ওদের মারের মুখে যদি আমাদের দেবলোকের সব শির এগিয়ে দিই, তাহলে দুদিনই ওদের মারের অস্ত্র যাবে ভোঁতা হয়ে–মারের শক্তি যাবে ফুরিয়ে।

চতুর্থ সভ্য : আমাদের দলপতি ঠিক বলেছেন। কিন্তু এই প্রতিরোধই যথেষ্ট নয়। ওরা আমাদের অমৃত অপহরণ করে তার বদলে যে বিষ-মাখা খাদ্য জোর করে খাওয়াচ্ছে–আমরা শুকিয়ে মরলেও তা আর গ্রহণ করব না। আমাদের লজ্জা নিবারণ করতে হয় ভূতুড়ে কিম্ভূতকিমাকার বস্ত্র দিয়ে, আমরা আর তা পারব না। নির্যাতন আরো বেশি চলুক, তবু ওদের দান গ্রহণ করে আমাদের পবিত্র দেব-কান্তিকে আর অপবিত্র পঙ্কিল করে তুলব না।

(হঠাৎ সম্মুখ দিয়ে বিপ্লব-কুমার চলিয়া গেল)

জয়ন্ত : ওকে চেনেন আপনারা? ওই বিপ্লব-কুমার। কখনো গান গায় কখনো যুদ্ধ করে। কখন যে কি করে বুঝবার উপায় নেই। ভূতের চোখে ধুলো দিয়ে রাত-দিন ও এই দেবলোকে নানা মূর্তিতে বিপ্লবের আগুন জ্বেলে বেড়াচ্ছে। ভূতদের চেষ্টার আর অন্ত নেই ওকে বন্দি করার, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারে না। ও কি বলে, কি করে কিছুই বোঝা যায় না।

পঞ্চম সভ্য : ওই দেবলোকের একমাত্র যুবা–যে ভূতকেও ভয় দেখাতে সমর্থ হয়েছে।

(জলন্ত অগ্নি-বর্ণা। স্বাহা দেবীর প্রবেশ। সকলে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া দেবীকে অভ্যর্থনা করিলেন)

জয়ন্ত : আসু দেবী। আপনার কথাই ভাবছিলাম আমি।

স্বাহা : আমি কিন্তু আপনার কথা ভেবে এখানে আসিনি, জয়ন্তদেব! আমি ভাবছিলাম ঐ যুবকের কথা– যে এখনি গান গেয়ে চলে গেল।

www.nagorikpathagar.org

জয়ন্ত (ম্লানমুখে) : বিপ্লব-কুমারের কথা? কিন্তু ওর আদর্শ তো আমাদের আদর্শ নয়, দেবী!

স্বাহা : এতদিন তাই ভেবেছি। কিন্তু এখন ভেবে দেখলাম, আগুনকে ধোঁওয়া করে রাখায় কোনো লাভ নেই, ওতে চক্ষুই জ্বালা করে–দমই বন্ধ হয়ে আসে–দাহ করে না। আগুন যদি আমরা জ্বালিয়েই থাকি, তাহলে ওকে তুষ- চাপ দিয়ে ধোঁওয়া করে রেখে লাভ নেই, আগুন এবার ভাল করেই জ্বলে উঠুক।

জনৈক সভ্য : মার্জনা করবেন, দেবী। আপনি আমাদের দেবী-শক্তি। সমগ্র দেবী-জাতির প্রাণ-শিখা। তবু জিজ্ঞেস করি, তাহলে এ-আগুনে কি আপনিই কুলোর বাতাস করবেন?

স্বাহা : বিপ্লব-কুমারকে দেখে অবধি আমার মনে হচ্ছে আমাদের তাই করাই উচিত। পুরুষেরা যখন ভয়ে পিছিয়ে গেল, তখন নারীকেই এগিয়ে যেতে হবে বই কি! এমন পড়ে পড়ে আর কতদিন মার খাওয়া যায়? এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক!

তৃতীয় সভ্য : (হাসিয়া) আমাদের রান্নাঘরে থেকে থেকে আগুনটা গা সওয়া হয় গেছে দেবী, তাই আপনারা হয়ত ওটাকে ভয় করছেন না, কিন্তু উনুনের আগুন আর বিপ্লবের আগুন এক জিনিস নয়!

স্বাহা : উনুনের আগুন আমরা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করি, কিন্তু আপনাদের মুখে আগুন উঠেও– এত ধুমপান করেও তো আগুনের ভয়কে ছাড়িয়ে উঠতে পারলেন না। উনুনের আগুনেও তো আপনাদের অনেকে পুড়েছে, এবার না হয় ওর চেয়ে প্রখর আগুনেই পুড়বে। আমাদের তো পুড়ে মরতেই জন্ম!

জয়ন্ত : আমাদের কোনো সভ্যের প্রগল্‌ভতার জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি, দেবী। আপনি আমাদের পরিত্যাগ করলে আমরা সত্যসত্যই শক্তিহীন হয়ে পড়ব। আপনি দেবলোকের প্রাণ– স্বরূপা। আমাদের আছে শুধু অস্থি আর চর্ম, আপনাদের আছে প্রাণ। এই প্রাণ-শক্তি যেখানে যোগ দেবে সেইখানেই জয় অবশ্যম্ভাবী।

www.nagorikpathagar.org

স্বাহা : আমরা যদি সত্যই দেবলোকের প্রাণ-শক্তি হই, এবং যেখানে যোগদান করি, সেইখানেই জয় অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহলে আপনার দুঃখের তো কোনো কারণ দেখছিনে। দেবলোক ভূত-মুক্ত হোক এইতো আপনারা সকলে চান। সে মুক্তি আপনিই আসুক–আর বিপ্লব-কুমারই আনুক-তাতে তো কিছু আসে যায় না।

জয়ন্ত কিন্তু বিপ্লব-কুমারের আন্দোলন সে শক্তি আনতে পারবে না বলেই আপনাদের শক্তি সেখানে ব্যয় করে ব্যর্থতা আনতে নিষেধ করছি, দেবী। আমরা বলি, আমরা জয় করব সত্যের জোরে, আমরা সত্যাগ্রহী। বিপ্লব-কুমার বলে, সে জয় করবে অস্ত্রের জোরে– সে বলে, সে অস্ত্রাগ্রহী। কিন্তু ভূতের অস্ত্রবলের কাছে ওর মূল্য কতটুকু!

স্বাহা ও শুধু তাই বলে না। বলে, ভূত আর পশু, দুইটা জাতই আগুনকে অতিরিক্ত ভয় করে। এ ভূতের অর্ধেকটা পশু, অর্ধেকটা ভূত। একবার ভালো করে আগুন জ্বেলে তুলতে পারলে এরা তল্পিতল্পা তুলে লম্বা দৌড় দেবে।

জয়ন্ত আগুন তো আমরাও জ্বালাতে চাই, দেবী। সে আগুন অসন্তোষের আগুন।

স্বাহা : আগুন নয় জয়ন্তদেব, ও হচ্ছে ধোঁওয়া। বড় বড় ওঝাদের দেখেছি, তারা ভূত তাড়াবার জন্য শুধু ধোঁওয়া আর সর্ষে-পড়াই ব্যবহার করে না, –উত্তম-মধ্যম মারও দেয়! নমস্কার! (প্রস্থান)

জয়ন্ত আমি বিপ্লব-কুমারের খুব বেশি বিরোধী নই, কিন্তু আমার মনে হয়– সে প্রস্তুত না হয়েই নেমেছে। এতে সে দেবলোকের ক্ষতিই করবে।

সভ্যগণ (উঠিয়া পড়িয়া) এ সব আগুনের আলোচনার স্থান এ নয়। আমরা আমাদের সত্যচ্যুত হয়ে পড়ব এখানে থাকলে। এ আলোচনা আমাদের এবং আমাদের দেশের ক্ষতি করবে। আমরা আজ উঠলাম। আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ অন্যদিন অন্য স্থানে হবে। (সকলের প্রস্থান)

www.nagorikpathagar.org

(বিপ্লব-কুমার ও স্বাহা দেবীর প্রবেশ)

বিপ্লব-কুমার : আমি তখন এসে ফিরে গেছি , জয়ন্ত দেব। ঐ ভীরু লোকগুলোকে ভয় করিনে , কিন্তু যখন ভাবি যে, দেবলোকের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে ওরাই– তখন আর ক্রোধ সংবরণ করতে পারিনে। তখন এলে একটা বিশ্রী কলহের সূত্রপাত হত ভেবেই চলে গেছি।

জয়ন্ত : কিন্তু এখনই বা এসেছেন কেন? আপনি তো জানেন, আপনাদের এবং আমাদের পথ একেবারে বিপরীতমুখী।

স্বাহা : সেই মুখকে ঘুরিয়ে একমুখী করবার জন্যই আমি এসেছি, জয়ন্ত দেব!

জয়ন্ত : সে অধিকারের মর্যাদাকে আপনিই আগে ক্ষুণ্ন করেছেন দেবী। আপনি ক্ষমা করবেন, যদি আপনার অধিকারের সম্মান রাখতে না পারি। এ পথ এক হবার নয়। আপনি মনে করেছেন, আপনি এসেছেন আমাদের মাঝে সেতু হয়ে। কিন্তু তা নয়, বরং আমাদের মিলনের যে সম্ভাবনা ছিল, আপনি তাতে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছেন এসে!

[বিপ্লব-কুমার চমকিত হইয়া উঠিল। সে একবার জয়ন্তের দিকে, একবার স্বাহার দিকে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।]

স্বাহা : (ব্যথা-ক্লিষ্ট কণ্ঠে) তুমি ভুল করলে জয়ন্ত। এই ভুলের জন্য সারা দেবলোককে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সারা দেবলোকের যৌবনের মূর্ত প্রতীক তোমরা দুজন। তোমরাই যদি দ্বিধা-বিভক্ত হও, দেবলোকের কল্যাণ তাহলে পূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করবে কেমন করে? দেবলোকের কল্যাণের জন্য যদি আমি তোমাদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াই, তাহলে কি তোমরা এক হবে?

বিপ্লব-কুমার : এ সব হেঁয়ালির মানে তো বুঝতে পারছি নে, স্বাহা দেবী! আমি যা ভেবেছি, তাই যদি সত্য হয়–তাহলে আপনাদের দুইজনকেই বলে রাখি, আমায় দিয়ে আপনাদের কোনো

www.nagorikpathagar.org

পক্ষেরই কোনো লাভালাভের জয় বা আশা নেই। আমি স্বদেশ ছাড়া আর কিছুই জানিনে। জয়ন্তদেবকে সাথে পেলে আমার ব্রত সহজে উদযাপন হত। নাই পাই, ওঁকে নমস্কার করে চলে যাব। এর মাঝে মান-অভিমানের পালা আসবার তো কথা ছিল না।

জয়ন্ত আপনি আমার নমস্য বিপ্লব-কুমার! আমার নির্লজ্জতা ক্ষমা করুন। আপনার পার্শ্বে দাঁড়াবার মতো সংযম আর শক্তি যদি থাকত, আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। আমার সে শক্তিও নাই। তাছাড়া আপনার পথকে শ্রেষ্ঠ পথ বলে গ্রহণ করবার মতো বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি আজো। আপনার মন্ত্রে অবিশ্বাসী আপনার পথে শুধু বাধারই সৃজন করবে– পথকে এগিয়ে দিতে পারবে না।

বিপ্লব-কুমার : আপনার শক্তির উপর আপনার চেয়ে আমার বেশি বিশ্বাস আছে, জয়ন্ত দেব। কিন্তু সে শক্তিকে যখন আপনি দেশের বড় কল্যাণের জন্য দান করতে কার্পণ্য করছেন, তখন সেখানে আমার বলবার কিছু নেই। আমার শুধু একটি প্রশ্ন মনে রাখবেন–এবং পারেন তো পরে উত্তরও পাঠাবেন। সে প্রশ্নটি এই যে, দেবলোকের যৌবন আজো শুধু অতীতের দাসত্বই করবে, না সে তার নিজের পথ নিজে রচনা করবে? সোজা পথ দুরূহ বিপদ-সঙ্কুর বলেই কি তাকে ছেড়ে এক বছরের লক্ষস্থলে একশ বছরে পৌঁছুতে হবে? চললাম–স্বাহা দেবী, নমস্কার! আপনার এখন জয়ন্ত দেবের সাহায্য করাই উচিত।

স্বাহা এখন আপনার পিছনে চলা ছাড়া তো আর আমার অন্য পথ নাই, বিপ্লব-কুমার! যিনি আমাকে বুঝতেই পারেননি, তাঁর পথের বোঝা হয়ে থেকে কোনো লাভ নেই!!

জয়ন্ত : নমস্কার! (উভয়কে নমস্কার করিলেন)

বিপ্লব-কুমার : তাহলে আমার পশ্চাতেই আসুন! শক্তিকে ফিরিয়ে দিতে নাই।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় দৃশ্য

[গভীর পার্বত্য অরণ্য। সেই অরণ্যে রক্ত-বাস-পরিহিত যোদ্ধবেশে বিপ্লবী দেব-যুবাদল ও বিপ্লব-কুমার। পর্বতের সানুদেশে পর্বত ঘিরিয়া ভূতের শত শত কালো তাম্বু। পর্বত-শিখর অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণ শকুনের মতো দলে দলে ভূতের রথ উড়িয়া ফিরিতেছে।]

বিপ্লব-কুমার : বীর দেব-সেনাদল! আজ আমাদের শেষ ভাগ্য-পরীক্ষা, ভাগ্য-দেবী সুপ্রসন্ন, এমন দুরাশা করিনে। তবু যাবার আগে ভূতের নখর দন্তগুলো নিঃশেষ করে দিয়ে যেতে চাই– আমাদের এই মুষ্টিমেয় দেব-যুবার আত্মবলিদানে। কত বড় বিপুল শক্তি শুধু আত্মশক্তির অ-পরিচয়ে, আত্ম-চেতনার অভাবে নিষ্ক্রিয় নিবীর্য হয়ে দিনের পর দিন ক্লিষ্ট পিষ্ট পদদলিত হচ্ছে– শুধু সেইটুকু জানিয়ে যেতে পারলেই বুঝব– আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি। বাকি কাজ দেবলোকের অনাগত যুবারা স্বল্পায়াসেই করতে পারবে।

দেব-সেনাদল : জয় শিব শঙ্কর! জয় দেবলোকের জয়!

[গান করিতে করিতে দেব-যুবাদলের অগ্র-গমন]

বজ্র-আলোকে মৃত্যুর সাথে
হবে নব পরিচয়।
জয় জীবনের জয়॥
শক্তিহীনের বক্ষে জাগাব
শক্তির বিস্ময়।
জয় জীবনের জয়॥
মরু-অরণ্য গিরি-পর্বতে রচিব রক্ত-পথ,
সেই পথ ধরি ভবিষ্যতের আসিবে বিজয়-রথ।
আমাদের শত শব-চিন্ ধরি
আসিবে শক্তি প্রলয়ংকরী,
আসিবে মোদের রক্ত সাঁতারি
নবীন অভ্যুদয়
জয় জীবনের জয়॥

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লব-কুমার : সাবাস জোয়ান! এইবার হানো বজ্র, হানো ত্রিশুল, হানো পরশু–ঐ ভূতের বাথান অস্ত্র লক্ষ্য করে।

[দেব-যুবাগণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগির। ঊর্ধ্ব অধঃ সম্মুখ, পশ্চাত-সকল দিক দিয়া পশু-মুখ ভূতের দল অলক্ষ্যে অস্ত্র হানিতে লাগিল।]

দেব-যুবাগণ : সেনাপতি! আমাদের অস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে।

বিপ্লব-কুমার : (যুদ্ধ করিতে করিতে) শুধু হাতে-পায়ে যুদ্ধ কর। হত আহত সৈনিকের হাত ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে আক্রমণ কর। মনে রেখো বন্ধু আমরা কেউ ফিরে যাবার জন্য আসিনি!

[দেবযুবাগণ শুধু হাতে ভূতেদের উপর লাফাইয়া পড়িল। হত-আহত সৈনিকদের হাত-পা ছিঁড়িয়ে লইয়া আঘাত হানিতে লাগিল। ভূতের তাম্বুতে ভীষণ সন্ত্রাস। কিচিরমিচির শব্দ উত্থিত হইল। ভূতের সিংহ-মুখ সেনাপতির ইঙ্গিতে ভূতেরা ঊর্ধ্ব হইতে এক অদৃশ্য মায়াজাল নিক্ষেপ করিল। দেব-যুবাগণ সেই জালের প্রভাবে শক্তিহীন হইয়া বদ্ধহস্ত-পদ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। শত ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। ভূতেরা একে একে সকলকে বন্দী করিল।]

বিপ্লব-কুমার : রাক্ষুসী! এতেও তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি হল না? তোর বিজয়া দশমী কি চিরকালের জন্য হয়ে গেছে? আমার সেনাদল গেছে। আমি এখনো বেঁচে আছি। ওদের মায়াজালের বন্ধনকে অতিক্রম করে বাঁচার শক্তি আজো আমি হারাইনি। উঃ! পশ্চাৎ হতে আমায় আক্রমণ করেছে।

[কৃষ্ণবাস-পরিহিত একদল ভূত বিপ্লব-কুমারকে ভীষণ আক্রমণ করিলে। বিপ্লব-কুমার পড়িয়া গেল!]

স্বাহা : ভয় নাই বীর, আমি এসেছি। ঐ দেখ পশ্চাতে আমার নারী সেনাদল! ও-মায়াবী ভূতের মায়াজাল ছিন্ন করতে পারবে–এই মায়াবিনী নারীসেনা! ওদের অস্ত্র ব্যর্থ করতে পারব আমরাই।

বিপ্লব-কুমার : না দেবী, পারবে না। তুমি ভুলে যাচ্ছ, এ দেবতায় দেবতায় যুদ্ধ নয়। দেবতায় পশুতে যুদ্ধ এ। রক্ত-খেকো পশু আর রাক্ষস পুরুষ-নারীর সামনে রক্ত শোষণ করে। ওদের শক্তিকে

www.nagorikpathagar.org

ভয় করি না, ভয় করি ওদের উলঙ্গ নির্লজ্জতাকে। ওরা তোমাদের আমাদের দেব-লোকের প্রাণ-শক্তির অবমাননা করে যদি তার কর্তব্য সাধন করে–আমাদের দেবলোক কোন দিনই ভূতের গ্রাস থেকে মুক্ত হবে না। তুমি ফিরে যাও তোমার কাজ আমার এই হারাপথের সন্ধানী যুবকদের খুঁজে বের করা। তাদের এই মৃত্যু-পথের সন্ধান দেওয়া। আমরা আত্মদান করে ভয়-মুক্ত করে গেলাম জাতিকে, মৃত্যুঞ্জয় কবচ বেঁধে দিলাম দেবলোকের যুব-শক্তির বাহুতে। এর পরে যারা আসবে এই পথে তারাই আমাদের শবের কঙ্কাল ধরে ধরে আমাদের আহতদের রক্ত-চিহ্ন অনুসরণ করে যাবে আমাদের উদ্ধার সাধনে। ভূতের হাত থেকে অমৃতের উদ্ধার করে আমাদের বাঁচিয়ে তুলবে। সেইদিন আসব আমরা নতুন দেহে–নতুন রূপে। ধ্বংসের পূজারী-দল আসব নব-সৃষ্টির ধেয়ানী হয়ে। স্বাহা! আমি যাই। উঃ!

স্বাহা : (বিপ্লব-কুমারের উপর পড়িয়া) বন্ধু! প্রিয়! তোমার শেষ দান আমায় দিয়ে যাও।

বিপ্লব-কুমার : আমার শেষ দান–আমার শক্তি তোমায় দিয়ে গেলাম। তারপর যা চাও, সে প্রীতি সে প্রেম–পাবে যখন আবার আমি আসব। সে আজ না, স্বাহা!

স্বাহা : (উঠিয়া পদধূলি লইয়া) তুমি শান্তিতে যাও বীর, আমি তোমার ব্রত গ্রহণ করলাম।

[বিপ্লব-কুমার দক্ষিণ কর ললাটে ঠেকাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।]

It's a Personal Collection of
Sazaul Morshed Sazib
NSTU, Pharmacy (5th Batch)
Cell: 01918165031
Book No:
Date :
mail : sazibpharmacy.nstu@gmail.com

www.nagorikpathagar.org

জাগো সুন্দর চিরকিশোর

প্রথম অঙ্ক

(কোরাস্ গান)

জাগো সুন্দর চিরকিশোর
জাগো চির অমলিন দুর্জয় ভয়-হীন
আসুক শুভদিন, হোক নিশি-ভোর ॥
অগ্নিশিখার সম সূর্যের প্রায়
জ্বলে ওঠ দিব্য জ্যোতির মহিমায়
দূর হোক সংশয়, ভীতি, নিরাশা,
জড় প্রাণ পাষাণের ভাঙো ঘুমঘোর ॥

কঙ্কন : ওঙ্কার! ওঙ্কার! খেলতে খেলতে আমরা এ কোথায় এসে পড়েছি? কে আমাদের এখানে আনলে?

কল্পনা : আমি– তোমাদের দিদি কল্পনা। কঙ্কন। ভালো করে চেয়ে দেখ দেখি আমাকে চিনতে পার কিনা!

কঙ্কন : না–হ্যাঁ তোমায় যেন কোথায় দেখেছি, অথচ ঠিক মনে করতে পারছিনে।

কল্পনা : আচ্ছা আমি করিয়ে দিই। কাল রাত্রে ছাদে বসে চাঁদের দিকে চেয়ে চুপ করে কি ভাবছিলে, মনে পড়ে?

কঙ্কন : হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভাবছিলাম আমি যদি ঐ চাঁদের দেশে এক নিমিষে উড়ে যেতে পারতুম, তা হলে কি মজাই না হত। তারপর মনে হল আমার মনের ভিতর কে যেন এক ডানা-ওয়ালা সুন্দরী পরী আছে, সে যেন যাদু জানে, সে যেন এক নিমিষে আমায় যেখানেই ইচ্ছা সেইখানে নিয়ে যেতে পারে!

কল্পনা : ঠিক ধরেছ! এখন চেয়ে দেখি, আমি সেই পরীর মত কি না!

www.nagorikpathagar.org

কঙ্কন আরে ঠিক সেই ত! এক্কেবারে হুবহু মিল! আমার মনের সেই পরী তুমি। তোমার নাম কি বললে?

কল্পনা : আমার নাম কল্পনা। আমার কল্পনা দি বলে ডেকো!

কঙ্কন : ধ্যেৎ, তুমি যে মাথায় আমারই মত বড়। তোমাকে– আচ্ছা দিদি বললে যদি সুখী হও, তাই বলব। কিন্তু–

কল্পনা : বুঝেছি– আর বলতে হবে না। তুমি যেখানে যেতে চাইবে, আমি সেইখানেই তোমায় নিয়ে যাব। এখন চল সাগর-জলের তলে। (সাগরের শব্দ ভেসে এল।)

কামাল : এই কঙ্কন! পালিয়ে আয়। ও যাদু জানে, পরীর বাচ্চা, উড়িয়ে নিয়ে যাবে! এই যা! তোর মাদুলিটা ফেলে এসেছিস্ বুঝি? দেখি আমার তাবিজটা আছে কিনা! এ্যাঁ, আমার তাবিজটা কে নিলে?

কল্পনা : এখন আর কোনো বীজেই কিছু ফল হবে না কামাল! ওকি ওঙ্কার, অমন চোখ বুজে আছে কেন?

ওঙ্কার : ভয় পেলে আমি চোখ বুজে বসে থাকি। কিংবা প্রাণপণে চেঁচিয়ে গান করি।

কল্পনা : এই চোখ বোজা কার কাছে শিখলে?

ওঙ্কার : ভেড়ার কাছে।

কল্পনা : ভেড়ার কাছে?

ওঙ্কার : হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ে দেখেছিলুম, একপাল ভেড়ার মাঝে একটা নেকড়ে বাঘ এসে পড়ল। যাঁহা নেকড়ে বাঘ দেখা, আর অমনি পালের সব ভেড়া গোল হয়ে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল।

কল্পনা : আর, তাই দেখে বুঝি নেকড়ে বাঘ পালিয়ে গেল!

ওঙ্কার : দুর! তা হবে কেন? নেকড়ে বাঘ ভেড়াদের এক একটার কান ধরে নিয়ে যায়।

চাকাম্ ফুস্‌ফুস্ : ওরেবাব্বারে! গেছি রে গেছি রে, একেবারে মরে গেছি রে মা! (সমস্ত 'স' এর উচ্চারণ দন্ত্য'স দিয়ে) আজ সকালে সালকের শ্মশান ঘাটে সিনান করতে গিয়ে এই সর্বনাশটা হল। শ্মশানের শ্যাওড়া গাছের শাঁকচুন্নিতে ধরেছে রে বাবা!

www.nagorikpathagar.org

কল্পনা : ও কে চীৎকার করে, অমন করে? কে ঐ ভীরু?

কঙ্কন : ওর নাম ন্যাড়া, আমরা ওর নাম রেখেছি চাকাম্ ফুসফুস! ও বড় ভীতু কিনা। একটু কিছু ভয়ের কথা শুনলেই ওর ফুসফুস চুপসে গিয়ে বুকে গর্ত হয়ে যায়।

কামাল : আর মুখ শুকিয়ে গিয়ে চাকাম চুকুম শব্দ করে থাকে– তাই ওঙ্কার ওর নাম রেখেছে চাকাম্ ফুসফুস।

(সমুদ্রের শব্দ)

ওঙ্কার : উঃ কী ভীষণ গর্জন।

কামাল : কী ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস। আমার গা শিরশির করছে!

চাকাম্ ফুসফুস : আমার দাঁতে দাঁত লাগছে! শ্মশান দেখে কী সর্বনাশটাই হল! হি হি হি হি! (দাঁতে দাঁত লাগার শব্দ)

কঙ্কন : আমার কিন্তু চমৎকার লাগছে কল্পনা-দি, কিন্তু এত অন্ধকার কেন? সমুদ্রে কি আলো নেই?

কল্পনা : সাগর-জলের নিচে মণি-মুক্তার আলো! আর দেরি নেই, ঐ আমরা এসে পড়েছি– সাগর জলের পাতাল তলে! খোলা দুয়ার।

(হঠাৎ যন্ত্র-সঙ্গীত ও সাগর-গর্জন বন্ধ হয়ে গেল)

কঙ্কন : (হাততালি দিয়ে) কল্পনা-দি, দেখ দেখ, কী সুন্দর আলো! কত হীরা-মানিক-মুক্তো! কামাল! ওঙ্কার!

কামাল : এই কঙ্কন, খবরদার, ও-সব হীরা-মানিক ছুঁসনে। আমাদের গাঁয়ে একজন পুঁথি পড়ছিল, তাতে লেখা আছে– ও-সব পরীদের হিকমত। ছুঁলেই পাথর হয়ে যাবি।

ওঙ্কার : হাফ্‌প্যান্টের পকেট ত ভর্তি হয়ে গেল হীরা-মানিকে। আর নিই কোথায়? বাবাকে কতবার বললাম যে, হাফপ্যান্টে দুটো বুক পকেট করে দাও, তা বাবা শুনলেন না। গায়ের জামাটাও ভুলে এলুম!

চাকাম্ ফুসফুস : ওরে বাপ্ রে! কী সর্বনাশটাই হল। এ যে খই মুড়ির মত হীরা ছড়ানো রয়েছে! নিলে শ্যাওড়া গাছের ঐ শাঁকচুন্নিটা ধরবে না ত?

কল্পনা শোনো কঙ্কন, ওঙ্কার, কামাল! তোমরা বড় হয়ে আসবে এই সাগর-জয়ে! এই সাগরকে যে জয় করবে– সেই পাবে এই সাগরতলের হীরা-মানিক-মুক্তা। এই পাঞ্চজন্য শঙ্খে বেজে উঠবে তারি শুভ আগমনী বার্তা! কামাল তুমি কি হবে?

www.nagorikpathagar.org

কামাল : আমি সাগর পাড়ি দেবো, হব সওদাগর।
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচা-কেনা বিশ্ব-জোড়া হাটে।
ময়ূরপঙ্খী বজরা আমার লাল রাঙা পাল তুলে
ঢেউ-এর দোলায় হাঁসের মতন চলবে হেলে দুলে।
চারপাশে মোর গাংচিলেরা করবে এসে ভিড়,
হাতছানিতে ডাকবে আমায় নতুন দেশের তীর।

কল্পনা : আর কঙ্কন?

কঙ্কন : সপ্ত সাগর রাজ্য আমার, হব সিন্ধুপতি;
আমার রাজ্যে কর জোগাবে রেবা ইরাবতী।
কত সিন্ধু ভাগীরথী ॥
রক্ত-রাঙা পলার দ্বীপে রাজধানী মোর হবে,
জয়-গান মোর উঠবে নিতুই সাগর-রোলের স্তবে।
সপ্ত দ্বীপে পৃথিবীরে রইবে সদা ঘিরে
যেন কোলের খোকার মতো আমার সাগর-নীরে।
সাগর-তলের সপ্ত পাতাল নাই সন্ধান যার
জয় করব, আমি তারে করব আবিষ্কার ॥

(সাগর-জলের শব্দ! পুষ্পরথ যেন সাগর হতে উঠে অন্যত্র চলে গেল!)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(ভোর হয়ে এল। পাখির কলরব ভেসে আসছে।)

বেণু : কঙ্কন-দা, ওঙ্কার-দা! চোখ খোলো, আমরা সমুদ্দুর থেকে উঠে পৃথিবীতে এসে পড়েছি। ঐ দেখ, সূর্য্যি উঠছে।

ওঙ্কার : বায়স্কোপের সূর্য্যি নয় ত। কল্পনা-দির মায়ায় সব যে ভুল দেখছি মনে হচ্ছে।

কল্পনা : খুকি, তুমি কোত্থেকে এলে? তোমার নাম কি?

বেণু : আমার নাম বেণু। আমি কোথাও থেকে আসিনি, এইখানেই লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। সব শুনেছি, সব দেখেছি। ভয়ে কথাটি কইনি!

www.nagorikpathagar.org

কল্পনা : তা বেশ, আমরা এখন চাঁদের দেশে, মঙ্গল গ্রহে যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

বেণু : (ভয় পেয়ে) না! আমাকে 'হেদো'র কাছে নামিয়ে দাও, আমি এক ছুটে বাড়ি পালাব!

ওঙ্কার তোর আঁচলে কি রে বেণু? অ! আমার হাফ্‌প্যান্টের পকেট থেকে সব মুক্তো-মানিক চুরি করেছিস বুঝি? দে, দে আমার মুক্তো দে।

বেণু : বা রে, তোমার ছেঁড়া পকেট গলে ওগুলো আপনা থেকে থেকে আমার কাছে এসেছে! আমি চুরি করব? আচ্ছা, ওঙ্কার-দা, তোমরা ব্যাটা-ছেলে, তোমরা ও নিয়ে কি করবে? এখন ওগুলো আমার কাছে থাক, তোমার বৌ এলে মালা গেঁথে উপহার দেবো।

চাকাম ফুস্‌ফুস্ : (কল্পনাকে উদ্দেশ্য করে) কাল-ফণী দিদি! ঐ শ্যামবাজারের দোতলা বাস যাচ্ছে– ওর ছাদে আমায় টুপ্ করে ফেলে দাও না! আমি সাঁ করে সোজা সরে পড়ি। কী সর্বনাশটাই হল আমার।

কল্পনা : তোমার ভয় দূর না হওয়া পর্যন্ত এমনি ভয় দেখিয়ে নিয়ে বেড়াব তোমায়। ভয়ের মাঝে রেখেই তোমার ভয় দূর করব। আচ্ছা বেণু, তোমার কী ভালো লাগে? চাঁদের, না, মাটির পৃথিবী?

বেণু : মাটির পৃথিবী। আমি এই পৃথিবীকে খুব ভালোবাসি। একে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। ও যেন আমার মা।

কল্পনা : আচ্ছা, সেই পৃথিবীতে তোমার কী হতে ইচ্ছা করে?

বেণু : আমার ইচ্ছা করে–

আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠব আমি ডাকি।
সূর্য্যিমামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে
"হয়নি সকাল, ঘুমো এখন" মা বলবেন রেগে।
বলব আমি "আলসে মেয়ে, ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে না ক?
আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?
তোমার মেয়ে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে।"
ঊষা দিদির ওঠার আগে উঠব পাহাড়-চূড়ে,
দেখব নিচে ঘুমায় শহর শীতের-কাঁথা মুড়ে।

www.nagorikpathagar.org

ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহনায়,
বলব আমি, ভোর হল যে, সাগর ছুটে আয়" ।
ঝর্ণা-মাসি বলবে হাসি, "খুকি এলি না কি?"
বলব আমি, "নই ক খুকি, ঘুম জাগানো পাখি!"

ওঙ্কার : কল্পনা-দি! মঙ্গল গ্রহ না চাঁদের দেশে যাবে বলছিলে না? সমুদ্রের জলে ভিজে আমার ভীষণ সর্দি করেছে– তাই বলছিলুম যা যুদ্ধ লেগেছে কল্পনা-দি, তাতে বুঝে দেখলুম, আমার রাজা-টাজা হয়ে পোষাবে না । ও ঝক্কির চেয়ে অনেক ভালো–
আমি হব গাঁয়ের রাখাল ছেলে!
আঁচল ভরে মুড়ি নেবো, হাতে নেবো বেণু,
নদীর পারে মাঠের ধারে নিয়ে যাব ধেনু ।
বাছুরটিকে কোলে করে পার হব বিল খাল,
বটের ছায়ায় জুটবে এসে রাখাল ছেলের পাল ।
আমি হব রাখাল-রাজা মাঠের তেপান্তরে,
ছাতিম তরু ধরবে ছাতা আমার মাথার পরে ।
শালের পাতায় মুকুট গড়ে পরিয়ে দেবে তারা,
সিংহাসনে পাতবে এনে নবীন ধানের চারা
সন্ধ্যা হলে বাজিয়ে বেণু গোঠের ধেনু লয়ে
ফিরব ঘরে মাঠের রাখাল মায়ের দুলাল হয়ে!

কঙ্কন : কল্পনা-দি, তোমার রথ থামিও না । চল হিমালয়ের গৌরীশঙ্করের চূড়ায়, উত্তর-মেরু, দক্ষিণ-মেরু বরফ পেরিয়ে নাম-না জানা দেশে । চল চাঁদের বুকে, মঙ্গল গ্রহে ।

কল্পনা : তোমায় নিয়ে যাব কঙ্কন, অসীমের সীমা খুঁজতে-অকূলের কূল দেখাতে । তার আগে তোমার পৃথিবীর কাজ সেরে নিতে হবে । ধর, পৃথিবীতে যদি তোমায় কাজ করতে হয়– তুমি কী করবে?–

কঙ্কন : আমি গাইব গান– আর সারা পৃথিবীর মানুষ ধরবে তার ধুয়া ।

www.nagorikpathagar.org

(গান)

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল...

কল্পনা : শুধু গান গাইবে? কর্ম করবে না?

কঙ্কন : কর্মই ত আমার প্রাণ। কাজ করি বলেই ত রাত পোহায়।
আমি হব দিনের সহচর
বলব, ওরে, রোদ উঠেছে, লাঙল কাঁধে কর।
তোদের ছেলে উঠলে জেগে, ঐ বাজে তার বাঁশি,
জাগল দুলাল বনের রাখাল, ওঠ রে মাঠের চাষী।"
"শ্যাওলা' হাঁসা দুই না বলদ দুই ধারেতে জুড়ে
লাঙলের ঐ কলম দিয়ে মাটির কাগজ খুঁড়ে
লিখব সবুজ-কাব্য আমি, আমি মাঠের কবি–
ওপর হতে করবে আশিস দীপ্ত রাঙা রবি।
ধরায় ডেকে বলব, ওগো শ্যামল বসুন্ধরা।
শস্য দিয়ো আমাদের এবার আঁচল-ভরা।
জংলি মেয়ে ছিলে তুমি, ছিল না ক ছিরি
মরুর বুকে থাকতে শুয়ে ফিরতে দরী গিরি।
আমরা তোমায় পোষ মানিয়ে দিয়েছি ঘর বাড়ি
গা-ভরা তোর গয়না মা গো, ময়নামতীর শাড়ি!
জংলা কেটে ক্ষেত করেছি, ফসল সেথা ফলে,
পাহাড়ে তোর বাংলো তুলে দ্বীপ রচেছি জলে।
বন্য-মেয়ে! আমরা তোরে করেছি রাজরাণী,
ধুলাতে তোর পেতেছি মা সোনার আসনখানি।
খামার ভরে রাখব ফসল, গোলায় ভরে ধান,
ক্ষুধায় কাতর ভাইগুলিকে দেবো আমি প্রাণ।
এই পুরাতন পৃথিবীকে রাখব চির-তাজা,
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা।

(হঠাৎ সকলে "ধর ধর গেল গেল" বলে চীৎকার করে উঠল। চাকাম ফুসফুসের "কী সর্বনাশটাই হল রে বাবা" বলে চীৎকার শোনা গেল।)

www.nagorikpathagar.org

ওঙ্কার : কল্পনা-দি, কল্পনা-দি ধর ধর, চাকাম ফুস্‌ফুস্‌ হেদোর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে!

বেণু : (কাঁদতে কাঁদতে) চাকাম ফুসফুস আমার সব মুক্তো-মানিক চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে!

কল্পনা : (হেসে) ভয় নেই, ও জল থেকে সাঁতরে ডাঙায় উঠে বাড়ির দিকে দৌড় দেবে! তবে দৌড়ে পালাবে কোথায়? আবার আমার কাছে ধরা দিতেই হবে!– ও কি, বেণু কাঁদছ? ওগুলো মুক্তো-মানিক নয়। তোমরা শুধু ঝিনুক কুড়িয়ে এনেছ। যেদিন তোমার দাদারা সত্যিকার সাগর জয় করে আসবে আর তোমরা মেয়েরা তাদের সাহায্য করবে ঐ সাগর অভিযানে– সেইদিন সত্যিকারের মুক্তো মানিক পাবে।– তার আগে নয়।

কঙ্কন : ওদের নামিয়ে দিয়ে, আমার নিয়ে চল না কল্পনা-দি চাঁদের দেশে। সেখান থেকে আনব অমৃত পৃথিবীতে, জরা মৃত্যু থাকবে না– থাকবে শুধু সুন্দর চির-কিশোর।

[রথের দূরে যাওয়ার শব্দ]

(উড়ে চাকরের প্রবেশ)

হেই খোকাবাবু সব উঠ উঠ। সারা রাত্তির কি ছাদে শুয়ে থাকবে? ঠাণ্ডা লাগিব যে! উঠ! উঠ!

ওঙ্কার : কঙ্কন-দাকে উঠিয়ো না– ও এখন 'রকেটে' করে চাঁদের দেশে গিয়ে জ্যোৎস্নার আরক খাচ্ছে। আমি ততক্ষণ ওর পকেটের কমলালেবুটা খেয়ে ফেলি!

www.nagorikpathagar.org

কানামাছি

হেবো : এই ন্যাড়া, এই গুয়ে, এই খেঁদি! আয় ভাই কানামাছি খেলি। এই গুয়ে, তুই ভাই কানামাছি।

গুয়ে : না ভাই, তা কেন, এস গোনা হোক–

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুর বাড়ি
রেন্ কম ঝমাঝঝম্
পা পিছলে আলুর দম!

এই রে ন্যাড়া চোর। নে ওর চোখ বাঁধ। আচ্ছা রেডি–

সকলে : কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ,
কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ

ন্যাড়া : ওরে বাবারে! ওরে বাবারে। (কান্না)

খেঁদি : ওঠ্ ভাই লক্ষ্মীটি, কাঁদতে নেই।

ন্যাড়া : না ভাই, আমি আর খেলব না। আমার বড্ডো লেগেছে।

হেবো : চোর দেয় না বাড়ি যায়
হাঁড়ি-বাড়ি ভাত খায়!

খেঁদি : ছি ছি ছি, দেখছিস, ওরা কি বলছে? ওঠ চল খেলি চল্।

ন্যাড়া : উঃ, আমার ভয়ানক লেগেছে। কাঠটা শক্ত যেন কাঠ।

গুয়ে : নারে, ওটা কাঠ না, ওটা তালগাছ। দাঁড়া না ওকে হুলোই।

(ছড়া গান)

ঝাঁকড়া-চুলো তালগাছ, তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই?
আমার মতন পড়া কি তোর মুখস্ত হয় নাই ॥

তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই?
আমার মতন একপায়ে ভাই
দাঁড়িয়ে আছিস্ কান ধররে ঠায়
একটুখানি ঘুমোয় না তোর পণ্ডিত মশাই ॥

www.nagorikpathagar.org

তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই?
মাথায় তুলে পাততাড়ি তোর
কি ছাই বকিস্ বকর বকর?
আমতা আমতা করে, নামতা পড়িস কি সদাই?

তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই?
তালগাছ তোর মাথা কোলে
বাবুই পাখির বাসা ঝোলে,
কোচর-ভরা মুড়ি যেন, দে না দুটি খাই।

তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই ?
পাখিরা তোর মাথায় এসে
উড়ে এসে জুড়ে বসে,
ঠুকরে ওরা দেয় কি মাথায়, পাতা নাড়িস্ তাই?

তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই ?

www.nagorikpathagar.org

নবার নামতা পাঠ

(ছড়া গান)

নবা — একদা এক হাড়ের গলায়
বাঘ ফুটিয়াছিল–

নবার বাবা : হাঁ রে নবা, এই বুঝি তোর নামতা পড়া হচ্ছে? খেয়ে উঠে যদি তোর নামতা পড়া না পাই, তা হলে আজ তোর হাড় এক জায়গায় মাংস এক জায়গায় করব। বুঝলি?

নবা : না বাবা, আমি ত পড়ছি।

(নামতা পাঠ)

একেককে এক—
বাবা কোথায়, দেখ।
দুয়েককে দুই—
নেই ক? একটু শুই।
তিনেককে তিন—
উহুহু! গেছি! আলপিন!
চারেককে চার—
ঐ ঘরে আচার!
পাঁচেককে পাঁচ—
হুই দেখ্ কুলের গাছ।
ছয়েককে ছয়—
বাবা গুড বয়।
সাতেককে সাত—
পণ্ডিত মশাই কাত!
আটেককে আট—
আমি বড় লাট।
নয়েককে নয়—
আর একটু ভয়।
দশেককে দশ—
বাবা আপসি। ব্যস।

www.nagorikpathagar.org

(ছড়া গান)

আমি যদি বাবা হতুম,
বাবা হত খোকা।
না হলে তার নামতা পড়া,
মারতাম মাথায় টোকা ॥

রোজ যদি হত রবিবার
কি মজাটাই হত যে আমার।
থাকত না আর নামতা পড়া
লেখা আঁকা জোকা।

থাকত না আর যুক্ত অক্ষর
অঙ্কে ধরত পোকা।
আমি যদি বাবা হতুম,
বাবা হত খোকা ॥

www.nagorikpathagar.org

জুজুবুড়ির ভয়

(দুপুর বেলায় খোকারা সব ছাদে গিয়ে কিৎকিৎ খেলছে)

ন্যাড়া : ভেল্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ ।

হেবো : আমাদের মড়া মরেছে, কাঠ কুড়োতে যাবি কে,
আমাদের মড়া মরেছে, কাঠ কুড়োতে যাবি কে ।

হরে : মোড়, মোড়, মোড় ।

পুঁটো : ছেলকপাটি বৃন্দাবন,
ছেল কপাটি দাঁত কপাটি
ন্যাড়া মাথায় মারব চাঁটি ।
আমপাতা জোড়া জোড়া—
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া—
হাডু ডুডু ডু....

মা : ও পুঁটো, ও হেবো, ও হরে! দুপুর রুদ্দুরে বাঁদর ছেলে কিৎকিৎ খেলা হচ্ছে । শীগগির নেমে আয়!

হেবো : এই ন্যাড়া, মা ডাকছে, শীগগির চ' ।

মা : কতদিন বলেছি, দুপুর বেলা ঘরে বসে বসে পড়বি, শীগগির বই নিয়ে বস ।

হেবো : ওরে মায়ের বাবারে । ছাড় ছাড়, কান গেল কান গেল! ছাদে খেলছিলুম কোথায়, ছাদে ত জুজুবুড়ি তাড়াচ্ছিলুম, তোমায় ধরতে এসেছিল ।

খুকি : মা গো, তোরে সত্যি বলি, দেখে এলুম ছাদে গিয়ে,
মা-ধরা এক জুজুবুড়ি বসে আছে ঝুলি নিয়ে ।
বললে, "যে মা খোকায় ধরে যখন তখন দুধ খাওয়ায়
চুলের মুঠি ধরে তার তিন সের দুধ খাওয়াই তায় ।"
খবরদার মা, দুধ খেতে আর বলিসনে কো জোর দিয়ে ।

হেবো বললে বুড়ি, "জল ঘাটলে বকে খোকায় যে সব মায়
হাবুডুবু খাওয়াই তাদের ডুবিয়ে কাঁদা-জল ডোবায়!"
খবরদার মা, বকিসনে আর খেললে আমি জল নিয়ে ।

www.nagorikpathagar.org

খুকি		না বেড়াতে দিয়ে রোদে, ধরে যে মা পাড়ায় ঘুম,
বলে বুড়ি, বস্তায় পুরে লাগাই তারে ধুমাদ্দুম।"
খবরদার মা, ঘুম পাড়াসনে, বেড়ালে রোদে গিয়ে।

মা		: দাঁড়া, তোদের জুজুবুড়ি তাড়ানো দেখাচ্ছি। এই ন্যাড়া, হেবো, হরে। শীগগির বই নিয়ে বস। এই খুকি, ঘুমাবি আয়।

ঘুম আয় ঘুম! ঘুম আয় ঘুম!
নিশুতি দুপুর, নিশীথ নিঝুম।

ঘুম আয় ঘুম, ঘুম আয় ঘুম!
টুলুটুলু ঝিঙেফুল ঘুমে ঝিমায়,
ঝুমকো লতায় ঝিঁঝি আলসে ঘুমায়।

খোকনের চোখে দে ঘুম-পরী চুম।
ঘুম আয় ঘুম, ঘুম আয় ঘুম!

www.nagorikpathagar.org

ছিনিমিনি খেলা

ন্যাড়া : এই গুয়ে। পুকুরের অত কাছে যাসনে পা পিছলে পড়ে যাবি। দেখছিস নে পুকুরটা জলে কি টইটুম্বর হয়ে উঠেছে।

গুয়ে : দেখ না ভাই, কি সুন্দর শাপলা আর সুঁদি ফুল ফুটে রয়েছে। চারটী তুলে নিই।

ন্যাড়া : ওরে না না, মা বলেছে পুকুরে জল-দানো আছে। ঠ্যাং ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে আয় চারটী খোলামকুচী কুড়িয়ে এনে ছিনিমিনি খেলি। আচ্ছা পুটো! তুই আগে ছোড়–

পুটো : না ভাই দেখ দেখ। ব্যাঙটার মাথায় লেগেছে ঐ দেখ জলে নেমে চিৎ হয়ে পড়ল। ঠিক যেন মণিব্যাগ ভাসছে।

খেঁদি : আচ্ছা ভাই, মা বলে জল ঘাঁটলে সর্দ্দি হয়, কই ব্যাঙের ত সর্দ্দি হয় না।

[ও ভাই কোলাব্যাঙ]

(ঘঘং ঘঘং ঘ্যাং)

আমি পদ্ম-দীঘির ব্যাঙ
আনন্দে আজ নাচ জুড়েছি,
ড্যাং ডা ডা, ড্যাং ড্যাং
আমার সাথে লাগতে এলে
মারব তেড়ে ল্যাং।

ও ভাই কোলা ব্যাঙ
ও ভাই কোলা ব্যাঙ ॥

সর্দ্দি তোমার হয় না বুঝি
ও ভাই কোলা ব্যাঙ;
সারাটী দিন জল ঘেঁটে যাও
ছড়িয়ে দুটি ঠ্যাং॥

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ্মী মেয়ে মা তোর বুঝি
খেলে বেড়ায় না কো খুঁজি
কেউ বকে না মজাসে তাই
গাইছো ঘেঙর ঘ্যাঙ্ ॥

দিবা নিশি জল ঘাঁটো তাও
চোখ ওঠে না কি ওষুধ খাও?
জল-দানোটা আসলে ফেলে
দাও কি মেরে ল্যাঙ ॥

কত সে মাছ পুকুর ভরা
মাছ খাও রোজ টাটকা-ধরা
রুই মৃগেল, কাতলা চিতল,
মাগুর ল্যাটা চ্যাঙ ।

ব্যাঙ দাদা তোর মায়ের মত
মা যদি মোর লক্ষ্মী হত
তোর সাথে ভাই থাকতাম জলে
ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং ॥

ও ভাই কোলা ব্যাঙ
ও ভাই কোলা ব্যাঙ ॥

www.nagorikpathagar.org

পুতুলের বিয়ে

(পুতুল খেলিতে খেলিতে মেয়েদের গান)

খেলি আয় পুতুল-খেলা
বয়ে যায় খেলার বেলা সই।
বাবা ঐ যান আপিসে ভাবনা কিসের,
খোকারা দোলায় ঘুমায় ঐ ॥

দাদা যায় ইস্কুলেতে, মা খুড়িমা
রান্না করেন ঐ হেঁসেলে,
ঠানদি দাওয়ায় ঝিমোয় বসে
ফোকলা বদন মেলে।
আয় লো ভুলি পঞ্চি টুলি
পটলী খেঁদি কই।

কম্‌লি : তা হলে ভাই টুলি, তোকে আর টুলি বলব না। তুই আজ থেকে আমার বেয়ান হলি, কেমন? আজ যে আমার চীনে-পুতুলের সঙ্গে তোর মেম-পুতুলের বিয়ে।

টুলি : না ভাই কম্‌লি, তোর ঐ কদা-কুচ্ছিৎ চীনে-পুতুলটার সঙ্গে আমার মেম-পুতুলের বিয়ে দেবো না। বাবা! তোর ঐ পুতুলটা যা চোখ উল্টোয়। আমার পুতুল ওকে দেখলে ভয়ে আঁৎকে উঠবে। তার চেয়ে-তোর ঐ পুতুলটি, যার নাম রেখেছিস্ ডালিমকুমার–ঐটিকে আমি জামাই করব।

কম্‌লি : মা গো, কি হবে। তা হলে আমার চীনে পুতুলের বিয়ে হবে কি করে? ওকে যে কেউ বিয়ে করতে চায় না। অত বড় ছেলে আমার আইবুড়ো হয়ে থাকবে? মা গো, লোকে বলবে কি!

টুলি : তা ভাই, তুই বরং পঞ্চির মেয়ের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কর না।

পঞ্চি : কি কস। পঞ্চির বেডি অত হস্তা না। ওই চীনা অলম্বুসডারে জামাই করব নি। ওডা দেখবার যেন ভূতের লাহান, নামও তেমনি রাখছে ফুচুং। উয়ারে দেইহাই আমার মায়্যা এক্কুরে চিক্কুর পাইর‍্যা ফাল দিয়া উঠব। টুলি আপন বেডিরে দেয় না ক্যান?

টুলি : বাপরে ওকে আর ক্ষ্যাপাস্ নে ভাই। তার চেয়ে বরং বাঁকড়ি, খেঁদিকে বলে দেখ, সে যদি মেয়ে দিতে রাজি হয়!

www.nagorikpathagar.org

খেঁদি : বটে। সে হবেক্ নাই ভাই! আমার বিটিকে বিষ খাওয়াই মেরে ফেলব, তবু উ চীনাটাকে বিয়া দিব নাই! টুলি একটা চীনা মেয়্যা আনা করাক, উয়ার সঙ্গে তখন ঐ চীনা পুতুলের বিয়া দিবেক।

কম্‌লি : না ভাই, তোরা সব আমার খোকাকে অমন করে যা না তাই বলিসনে। খোকা একটু খ্যাঁদা আর চোখ একটু কুতুরে বলেই না তোরা ওকে চীনা মনে করিস্। ওকি আর সত্যিই চীনে? ওকে ত আমিই পেটে ধরেছি! ঐ দ্যাখ্ ও বুঝি কাঁদছে। ষাট, ষাট, বালাই!–

ধন্ ধন্ ধন্ ধন্ মুরলি
এই ধনকে দেখতে নারে কোন্ বেরালি!
ওকে কে বলে রে খ্যাঁদা,
তার চোখে লাগুক ধাঁধা।
খ্যাঁদা কি বলতে দেবো?
সোনা দিয়ে নাক বাঁধিয়ে দেবো ॥

টুলি : তাহলে ভাই, ডালিমকুমারের সঙ্গেই আমার মেয়ের সম্বন্ধ পাকা হল কেমন?

কম্‌লি : আচ্ছা ভাই, তাই নয়ত হল! তোর পুতুলের নাম কি ভাই? পুঁটুরানী, না? দে, বউকে একটু নাচাই।

পুঁটু নাচে কোনখানে
শতদলের মাঝখানে।
সেথায় পুঁটু কি করে,
ডুব্-গালিগালি মাছ ধরে।
মাছ ধরে আর ফুল পাড়ে
কুঁড়োজালি দিয়ে মাছ ধরে ॥

খেঁদি : এই। বিয়া যে দিবি নেমন্তন্ন করতে বেরাবি নাই? ইদিকে ম্যাগে ম্যাগে যে অনেক বেলা হয়ে গেল খ।

কম্‌লি : খ ঠিক বলেছ ভাই খ। না ভাই সত্যি, চল্-পটলিকে আর বেগমকে নিয়ে আসি।

টুলি : ঐ দেখ বেগম আসছে। হাঁ, দেখ, কম্‌লি, বেগমের সুন্দর একটা জাপানী পুতুল আছে, ঐটের সঙ্গে তোর চীনে পুতুলের বিয়ে দে না।

কম্‌লি : বেশ মনে করিয়ে দিয়েছিস ভাই। সেই-কী যেন একটা ছড়া আছে– ছাই মনেও পড়ছে না।

টুলি : ও। সেই ছড়াটা তো–

কুকুর দেবো বিয়ে বেগম-মহলে,
খুকু হবে বেগম সাহেব, বাঁদী সকলে।

www.nagorikpathagar.org

খুকু হাতে পরবে হীরের বালা
গলায় পরবে মুক্তোর মালা।
সোনার খাটে থাকবে শুয়ে রুপোর মহলে
শতেক বাঁদী বাঁধবে চুল নাইয়ে গোলাব-জলে ॥

(গান করিতে করিতে বেগমের আগমনে)

কুলের আচার নাচার হয়ে
আছিস্ কেন শিকায় ঝুলে।
কাচের জারে বেচারা তুই
মরিস্ কেন ফেঁপে ফুলে ॥
কাঁচা তেঁতুল পেয়ারা আম
ডাঁশা জামরুল আর গোলাপ-জাম–
যেমনি তোরে দেখিলাম
অমনি সব গেলাম ভুলে ॥

কম্‌লি : আয় ভাই বেগম, তুই আজ এত দেরি করলি কেন ভাই?

বেগম : বাপ রে। আব্বা যা বকেন ভাই, আমি বাইরে বেরুলে। আম্মাকে বলেন আমাকে পর্দার ভিতর বিবি করে রাখতে।

কম্‌লি : মা গো মা! কি হবে! অসৈরণ সইতে নারি! আট বছরের মেয়ে আবার বিবি হবে। যা না তাই! তোর সেই ছড়াটা কি রে বেগম?

বেগম : ও! সেইটে?–

মা গো মা,
আমি বিবি হব না।
আম কুড়োবো জাম কুড়োবো, কুড়োবো শুকনো পাতা,
সোয়ামী, করবে লাঙল-চাষ, আমি ধরব্ ছাতা।

টুলি এই বেগম! শুনেছিস? আমার মেম-পুতুলের সাথে কম্‌লির ডালিমকুমারের আজ বিয়ে।

বেগম সে কি ভাই! কম্‌লির ডালিমকুমার যে আমার জামাই হবে বলে কথা দিয়েছিল। আমার জাপানী পুতুলের কি হবে তা হলে?

কম্‌লি : তা ভাই, কি করি বল। তোরা সবাই চাস্ ডালিমকুমারকে জামাই করতে। ও বেচারা ছেলে মানুষ, কটা বউ সামলাবে বলত। তাতে আবার বিবি বউ! বউগুলোর আমার হাড় সেদ্ধ করে দেবে যে!

বেগম : তা আমি জানিনে ভাই। টুলি ত ফুচুংকে জামাই করবে কথা ছিল। আমার গেঁইসা পুতুল কি তা হলে কড়ে-রাঁড়ি হয়ে থাকবে?

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চি : কম্‌লি রে বোনডি। তোর পোলারে দুইট্যা মায়্যার সাথেই বিয়া দিয়া দে।

কম্‌লি : তাই ভাই ও মন্দ বলেনি। আমার ডালিমকুমার তোদের দু'জনার মেয়েকেই বিয়ে করুক। সে বেশ হবে। এক বউ শুয়ে থাকলে আর এক বউ মশা তাড়াবে।

টুলি কি? আমার মেয়ে সতীন নিয়ে ঘর করবে? আমি বেঁচে থাকতে নয়। আয় পুঁটু, তোর অন্য বর খুঁজিগে।

পঞ্চি বাপ্‌পুরে। তোমার পুতুলটা যেন হক্কল বুঝবার পারছে! পুতুল, তার আবার হতিন!

টুলি তুই বুঝবি কি লা? হতিস্ মেয়ের মা, তা হলে বুঝতিস! পুঁটু, বল ত মা সেই ছড়াটা?

আয়না আয়না আয়না
সতীন যেন হয় না।
উদবেড়ালী ক্ষুদ খায়
স্বামী রেখে সতীন খায়

খ্যাংরা খ্যাংরা খ্যাংরা
সতীনের মাথায় বেশ হয় উকুন আর ড্যাংরা।
বেড়ি বেড়ি বেড়ি
সতীন আবাগী চেড়ি।
খোরা খোরা খোরা
সতীনকে ধরে নিয়ে যায় যেন তিন মিনসে গোরা।
হাতা হাতা হাতা
খাই সতীনের মাথা।
থুতকুড়ি থুতকুড়ি থুতকুড়ি।
সতীন যেন হয় আঁটকুড়ি।
পাখি পাখি পাখি
নিচে মল সতীন আমি উপর থেকে দেখি।
ফুলগাছটি ঝিঁকুড়ি
সতীন আবাগী মেকুড়ি।
ঢেঁকিশালে শূল আর ঠুস্ করে মল।
বঁটি বঁটি বঁটি।
সতীনের ছেরাদ্দের কুটনো কুটি।
অশথ্ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আলতা পরি।

www.nagorikpathagar.org

খেঁদি : এতও জানে খ! ছড়ায় ছড়ায় ছিরকুটে দিলেক।

বেগম : নে ভাই, আর ঝগড়া করতে হবে না। আমি ঐ ফুচুং-এর সাথেই গেঁইসা পুতুলের বিয়ে দেবো।

টুলি : আঃ, তুই বাঁচালি ভাই বেগম। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক তোর।

কম্‌লি : নে ভাই, এইবার লগ্নের ব্যবস্থা দেখি। এখন যে একজন পুরুত ঠাকুরের দরকার। পাঁজি পুঁথি দেখবে কে?

টুলি হাঁ ভাই, বেশ মনে করেছিস! আমাদের বাড়িতে পুরুত ঠাকুর এসেছেন। মায়ের কি ব্রত আছে। আমি গিয়ে বুড়োকে ধরে আনি।

বেগম সব ত হল ভাই, আমার মেয়ের কপালেই ঐ চোখ উল্টানো চীনে পুতুলটা ছিল।

পঞ্চি : আরে যাইতে দে। পুতুলের তো বিয়া। ঐ চীনাডার সাথেই তোর জাপানী মায়্যাটার বিয়া দিয়া দে। আর কাইজ্যা করে না। দেহি রে কম্‌লি, তোর চীনা পুতুলডারে দেহি! মাইয়্যো গো, উয়ার চেহারাডা দেইখ্যা আমার একটা ছড়াগান মনে আইছে।–

ঠাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়
যাইতে যাইতে খ্যাচ্‌খ্যাচায়।
প্যাঁচায় গিয়া উঠল গাছ,
কাওয়ারা সব লইল পাছ।
প্যাঁচার ভাইশ্‌তা কোলা ব্যাং
কইল, চাচা দাও মোর ঠ্যাং।
প্যাঁচায় কয়, বাপ, বারিত যাও
পাছ লইছে সব হাপের ছাও।
ইঁদুর জবাই কইর‍্যা খায়
বেঁচা নাকে ফ্যাচফ্যাঁচায়॥

(সকলের হাসি)

বেগম : না ভাই। জামাইয়ের যা কেচ্ছা করছে, আমি ওর সাথে মেয়ের বিয়ে দেবো না।

খেঁদি : লে বাই, তুরা যদি ঝগড়াই করবি, বিয়া হবেক কখন? ইদিকে লগনের বেলা যে বয়ে গেল! আচ্ছা ভাই, মুসলমানের পুতুলের সাথে তোর পুতুলের বিয়া হবেক কি করে খ।

কম্‌লি : না ভাই, ও-কথা বলিসনে। বাবা বলেছেন, হিন্দু মুসলমান সব সমান। অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহও যা, আমাদের ভগবানও তা। বাবা আমাকে একটা গান শিখিয়েছিলেন, টুলি, তুইও ত জানিস্ ও গানটা, গা না ভাই আমার সাথে।

(ছড়া গান)

মোরা এক বৃন্তে দুটি ফুল হিন্দু মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তার প্রাণ ॥
এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান?

এক সে দেশের খাই গো হাওয়া এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক সে ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে, কেউ শ্মশানে ঠাঁই।
এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান ॥

টুলি : সত্যি ভাই, এক দেশে জন্ম, এক মায়ের সন্তান। অন্য ধর্ম বলে কি তাকে ঘেন্না করতে হবে?– এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে– আমি পুরুত ঠাকুরকে ডেকে আনি।

কম্‌লি : শীগগির আসবি কিন্তু ভাই। দাদা এলে কিন্তু সব তচনচ করে দেবে।

(গান করিতে করিতে কম্‌লির দাদামণির আগমন)

হেড মাস্টারের ছড়ি, সেকেন্ড মাস্টারের দাড়ি
থার্ড মাস্টারের টেড়ি, কারে দেখি কারে ছাড়ি।
হেড পণ্ডিতের টিকির সাথে ওদের যে আড়ি।
দাঁড়াইয়া ঐ হাই বেঞ্চে
হাসি রে মুখ ভেংচে ভেংচে,
খোঁড়া সেকেন্ড পণ্ডিত যায় লেংচে
হুঁকো হাতে বাড়ি,
তার মুখ নয় তেলো হাঁড়ি,
মোর হেসে ছিঁড়ে যায় নাড়ি ॥

www.nagorikpathagar.org

মণি : এই কম্‌লি, কি হচ্ছে? ওরে বাপ রে! কি সুন্দর সুন্দর সব পুতুল বের করা হয়েছে। দেখি, দেখি তোর পুতুল, আহা হাহা, ভাগ্নে আমার। এস এস, একটু আদর করি!

কম্‌লি : ওই যাঃ। আমার সায়েব পুতুলের ঠ্যাং ছিঁড়ে দিলে! হেই দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, লক্ষ্মীটি–আজ যে আমার পুতুলের বিয়ে। তোমারে খুব করে খেতে দেবো, মা কালীর দিব্যি করে বলছি।

মণি : হুঁম! মাস্টারমশাই-এর মার খেয়ে আজ ক্ষিদেটা বেশি রকমেরই হয়েছে। দে, তবে নিয়ে আয় খাবার।

কম্‌লি : ওমা, এখুনি খাবার কি! টুলি পুরুতকে ডাকতে গেছে, পুরুত ঠাকুর আসুন, বিয়ে হোক, তার পর না খাবার!

মণি : আরে, পুরুত ঠাকুর আবার কি মন্ত্র পড়াবে? দে, আমিই মন্ত্র পড়াচ্ছি–

আশীর্বাদং শিরশ্চেদং ধ্বংস নাশং
অষ্টাঙ্গে ধবল কুষ্টিং পুড়ে মরং।

খেঁদি : মা গো কি হবে! এই নাকি মন্তর হল খ!

মণি : এই বাঁকড়ি খেঁদি, চুপ কর্ বলছি, নৈলে তোর দাদাকে সুদ্ধু ডেকে আনব, মজাটা টের পাবি তখন।

বেগম : দোহাই মণিদা, ওকে আর ডাকতে হবে না! বাপ রে একা রামে রক্ষে নাই, তাতে আবার সুগ্রীব দোসর!

মণি : এই যে, বেগম। তুই কি খাওয়াবি? পোলাও মাংস কিন্তু। নৈলে তোর মেয়ের নাড়ি ভুঁড়ি বের করে দেবো, একেবারে হিরণ্যকশিপু বধ!

টুলি : এই যে ভাই পুরুত ঠাকুরকে এনেছি। বাবা, ঠাকুর কি আসতে চান। পাঁচ সিকে পয়সার কড়ার করে তবে এনেছি। ও বাবাঃ মণিদা যে! তা হলেই হয়েছে, সব ভণ্ডুল করবে।

পুরুত বলি, কি গো দিদি ঠাকরুনরা, বর কনে সব প্রস্তুত ত? এই সঙ্গে তোরাও কনে সেজে নে! আমারও এই সাথে একটা হিল্লে হয়ে যাক।

খেঁদি মা গো, বুড়ার ভীমরতি হঁয়েছে খ। কুঁজার আবার সাধ যায় চিত হয়ে শুতে খ।

পুরুত : কেন, আমায় বুঝি পছন্দ হল না? আরে, রোজ চাল-কলা খেতে পাবি। আর, মাসে চারখানা করে নতুন কাপড়।

কম্‌লি : রক্ষে করুন ঠাকুর, আমরা কি হনুমান যে, চাল-কলার লোভ দেখাচ্ছেন! এখন পাঁজি-পুঁথি বের করে বিয়ের লগ্ন দেখুন।

www.nagorikpathagar.org

মণি : পুরুত ঠাকুরের টিকিটি কি সুন্দর! যেন পারে যাবার টিকিট। আগায় আবার জবা ফুল বাঁধা, যেন, কুঁকড়ো ঝুলছে।

পুরুত : আরে রামঃ রামঃ! এ লক্ষ্মীছাড়াটা কোত্থেকে জুটল? না দিদি ঠাকরুন, আমার আর মন্ত্র পড়া হবে না। যা হনুমান জুটিয়েছ, ও চাল-কলা ত খাবেই, উল্টে জাত-ধর্ম পর্যন্ত নষ্ট করে দেবে!

মণি : ঠাকুর মশাই, ঠাকুর মশাই! আপনার চট্টোপাধ্যায় মশাই যে বঙ্কিম হয়ে চাতক পক্ষীর মতো হাঁ করে আছেন! বাবা, চটি ত নয় যেন জাঁতিকল! ওটা কি? গামছা? ওটা গাম ছা ত নয়, গাম ধাড়ি।

কম্‌লি আঃ কি হচ্ছে দাদা? না পুরুত মশাই, আপনি রাগ করবেন না। আপনি এখন দিন দেখুন।

পুরুত : হুঁ, বর কনেকে নিয়ে এস, যোটক মিলিয়ে দেখি। বাঃ বাঃ! চমৎকার বর কনে। এদের নাম কি?

কম্‌লি : বরের নাম ডালিমকুমার, কনের নাম পুঁটুরানী।

টুলি : আর একজোড়া বর কনে আছে পুরুত ঠাকুর। বরের নাম ফুচুং আর কনের নাম গেঁইসা।

পুরুত : এ রকম নাম ত সনাতন ধর্মে শোনা যায় না!

টুলি : হাঁ ঠাকুর মশাই, বর হচ্ছে চীনে, আর কনে হচ্ছে জাপানী।

পুরুত : তা হলে ঐ কম্‌লির দাদাই ওদের পুরুত হোক। ও-সব যাবনিক অনুষ্ঠান আমার জানা নেই।

মণি : বেশ, বেশ। এই কম্‌লি, শীগগির তুই তা হলে এক ঝুড়ি আরশোলা, গোটা দুই টিকটিকি, তিনটে সোনা ব্যাং, পোয়াখানিক কেঁচো, এক ডজন পচা ডিম আর খানিকটা নাপ্পি যোগাড় করে আন, বুঝলি? ভোজ হবে।

পঞ্চি : দ্যাহো দাদা, এইদুন এক চট্‌কনা লাগাইমু যে উৎকা মাইর‍্যা পইর‍্যা যাইব্যা! ওয়াক থুঃ! এ কি কয়, আমার বমি আইতেছে।

মণি : আরে, আরশোলার কাবাব, টিকটিকির চাটনি, পচা ডিমের ঘন্ট তার পর এই– কোলাব্যাঙের কাটলেট, এ সব না হলে চীনেদের ভোজ হবে কি করে? আর, বেগম! তোরা ত ঈদের সময় সামাই খাস, কেঁচো দিয়ে কি চমৎকার চীনে সামাই হবে।

বেগম : তৌবা, তৌবা! মণি দাদা, তুমি ভয়ানক দুষ্টু! পেটের ভাত পর্যন্ত উঠে আসছে।

পুরুত : হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ! টুলি, তুই ডেকে এনে আমার এই সর্বনাশটা করলি। আবার গঙ্গাস্নান করতে হবে দেখছি।

www.nagorikpathagar.org

মণি : তা ত হবে, কিন্তু ঠাকুর মশাই, এখানে গো-বর তো পাওয়া যায় না, খানিকটা নর-বর এনে দেবো?

কম্‌লি : দাদা, আমি চললাম মাকে ডাকতে! এখনি টের পাবে মজা!

মণি : আচ্ছা ভাই, এই আমি চুপ করলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে কিন্তু সন্দেশ রসগোল্লা চাই।

টুলি : এবার ঠাকুর মশাই লগ্ন ক্ষণ দেখুন না।

পুরুত : আর দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু লগ্ন, সব প্রস্তুত ত?

কম্‌লি : হাঁ সব প্রস্তুত। আমরা ততক্ষণ একটা বিয়ের গান গেয়ে নিই। আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন।

মিলন-গোধূলি রাঙা হয়ে এল ঐ
সোনার গগনময়।
দাও আশিস্ অভয়, যে দেব জ্যোতির্ময় ॥
মিলিল আবার দুইটি প্রাণ
কত যুগ পরে, হে ভগবান,
সার্থক কর, হে মনোহর, এ মিলন অবক্ষয়।
যেন চির-সুখী হয়, হে দেব জ্যোতির্ময় ॥

মণি : এই! বিয়ে যে হবে, তোদের ব্যাণ্ড কই, নহবৎ কই? শোন, আমি ক্যানেস্তারা বাজাই, বুঝলি? আর টুলি, তুই শিঙে ফোঁক। পঞ্চি, তুই ভেঁপু বাজা! বাজা, বাজা, বাজা!

(ক্যানেস্তারা ইত্যাদির বাদ্য)

কম্‌লি : দোহাই দাদা, থামো! তোমার রওশন-চৌকি মাথায় থাক। আমাদের রওশন-চৌকি আমাদের বাড়িতেই আছে। যা তো ভাই বেগম, তুই গ্রামোফোনে তালিম হোসেনের সেই সানাই-এর রেকর্ডখানা বাজা তো।

টুলি যা ভাই, বেশ মনে করিয়ে দিয়েছিস! (রেকর্ড বাজিয়া উঠিল) ঐ সে রেকর্ডখানা বেজে উঠল। এতক্ষণে না বে'বাড়ি বলে মনে হচ্ছে।

পুরুত : কই, বর কনেকে নিয়ে এস। বরের হাতে কনের হাত দাও। আহা হা হা, এত জোরে না! বরের হাত যে দেহ ছেড়ে চলে এল। হাঁ হাঁ, এই বার ঠিক হয়েছে। এইবার বল ত বাবা ডালিমকুমার–

যদিদং হৃদয়ং তব
তদিদং হৃদয়ং মম।

www.nagorikpathagar.org

মণি : অনুস্বারং আর বিসর্গং যদি সংস্কৃতং হয়তং তবে আমিং কেনং বসতং। এই। এইবার তোদের ফুচুং আর গোঁইসাকে নিয়ে আয়, আমি মন্তর পড়ি। হ্যাঁ বল ত বাবা ফুচুং–

ওয়ানং মর্ণং আই মেটং এ লেমং ম্যানং
ক্লোজং টু মাই ফার্মং।

পুরুত : বাপ রে বাপ, এ আবার কোন মন্তর রে বাবা! যেমন উনুন্‌মুখো দেবতা, তেমনি ছাইপাঁশ নৈবিদ্যি।

কম্‌লি : দাদার মন্তর ঠিক হচ্ছে তো পুরুত মশাই?

পুরুত : আরে, ঐ হয়েছে। হোক্ না কাঠের বেরাল, ইঁদুর ধরলেই হল। ঐ কারুর বিয়েতে হয় না!

কম্‌লি : নে ভাই টুলি, নে ভাই বেগম, থুড়ি বেয়ান, এইবার তোদের জামাইকে আশীর্বাদ কর।

বেগম : বাবা ফুচুং। উপরে আল্লাহ্ নিচে তুমি। দেখো, আমার মেইয়া যেন তোমার কাছে সুখে থাকে।

যেন গাই-বাছুরে গোহাল ভরে
ধনে জনে ঘর ভরে,
আদর আহ্লাদ উপচে পড়ে।
যেন অষ্ট সুখে খায়
সোনার পালঙ্কে নিদ্রা যায়।
ভিখ্-ফকিরে আঁজলা আঁজলা ভিক্ষা পায়।
শ্বশুর শাশুড়ির চৌদোল এসে
পঞ্চ বাজন বাজিয়ে নিয়ে যায়।

টুলি : বাবা! উপরে ভগবান, নিচে তুমি। তোমার হাতে মেয়েকে দিলুম। দেখো যেন কোনো কষ্ট দিও না।
রাজরাজেশ্বর স্বামী হোক,
ভীমার্জুন ভাই হোক।
যেন উমার মত আদর পাস,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পাস,
জয়া বিজয়া দাসী পাস,
কুবেরের ভাণ্ডার পাস।
ঘরে ঘটিবাটি ঝলমল করে,
আলনায় কাপড় দল্‌মল্ করে।

www.nagorikpathagar.org

বছর বছর পুত্র পাস।
হবে পুত্তুর মরবে না,
চোখের জল পড়বে না।

(উলু ও শঙ্খধ্বনি)

বেগম : এই পঞ্চি, তুই সেই লাল টুকটুক গানখানা গা না ভাই।

(পঞ্চির গান)

লাল টুকটুক্ মুখে হাসি মুখখানি টুলটুল।
বিনি পানে রং দেখে যা লাল-ঝুঁটি বুলবুল ॥
দেখতে আমার খুকুর বিয়ে
সূর্য্যি ওঠেন উদয় দিয়ে,
চাঁদ ওঠে ঐ প্রদীপ নিয়ে
গায় নদী কুলকুল ॥

খেঁদি : আমি আর কি আশীর্বাদ করব খ, তুরাই যে সব বলে ফেল্লি।

জন্ম জন্ম এয়ো হবি,
জামায়ের সুয়োরানী হবি
আকালের লক্ষ্মী হবি।
সময়ে পুত্রবতী হবি
সোনার কলসি টলমল
ঘটে ঘটে গঙ্গা-জল।
একূল থেকে ওকূলে যাবি,
দুইকূল শীতল করবি।
মায়ের কূলে ফুল বাপের কূলে ফল
শ্বশুর কুলে তারা,
তিন কূলে পড়বে জল গঙ্গা যমুনার ধারা।
মা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকী
তিন কুল ভরে দাও ধনে জনে সুখী।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চি : আমি ভাই আর কি কইমু–
চুল মেলবো সোনার খাড়ে,
নাইবা ধুইবা পদ্মার ঘাড়ে।
ভাত খাইবা সোনার থালে
রেন্নন খাইবা রূপার বাড়িতে।
আঁচাইবা ডাবর-ভরা
পান খাইবা বিরা বিরা।
সুপারি খাইবা ছরা ছরা,
খয়ের খাইবা চাক্কা চাক্কা।
চুন খাইবা খুঁটরি-ভরা,
পেচকি ফেলাইবা লাদা লাদা।

(উলু ও শঙ্খধ্বনি)

কম্‌লি : নে ভাই, লগ্নের বেলা যে বয়ে গেল, এখন সকলে মিলে বর কনেকে বরণ করি। তার আগে ভাই বেগম একটা ওদের বিয়ের গান গাক।

(বেগমের গান)

শাদী মোবারকবাদী শাদী মোবারক।
দেয় মোবারক-বাদ আলম্‌ রউলে-পাক আল্লা হক ॥
আজ এ খুশির মাহফিলে
দুলহা ও দুলহিনে মিলে
মিলন হল প্রাণে প্রাণে
মাশুক আর আশক ॥
আউলিয়া আম্বিয়া সবে
এস এ মিলন উৎসবে,
দোওয়া কর আজ এ খুশির
গুলিস্তান গুলজার হোক ॥

কম্‌লির ঠাকুরমা : ওরে ও-ও-ও কম্‌লি, ওলো ও টুলি, ওরে ভুলি রে, ও নবা–
টুলি : ওরে কলি, ঐ শোন ঠাকুমা ডাকাডাকি করছে। এই বেলা আশীর্বাদের গানটা গেয়ে নে।

www.nagorikpathagar.org

(গান)

সাবিত্রী সমান হও, লহ লহ এই আশিস।
শ্বশুর শাশুড়ির মা বাপের কুলের তারা হয়ে হাসিস।
লহ লহ এই আশিস ॥
রামের মত স্বামী পাস, সতী হস সীতার সম,
দশরথ কৌশল্যার মত শ্বশুর শ্বাশুড়ি অনুপম।
লক্ষ্মণ সম দেবর পেয়ে সুখের সায়রে ভাসিস।
লহ লহ এই আশিস ॥
গোয়ালে গরু, মরায়ে ধান,
সিঁথেয় সিঁধুর, মুখে পান,
আলতা পায়ে চির এয়োতি
যায় সুখে দিন এক সমান।
অন্নপূর্ণা জগৎ জীবের মা হয়ে ফিরে আসিস
লহ লহ এই আশিস ॥

সভা-উজ্জ্বল জামাই পাস,
ধরার মত সহ্য পাস,
জন্মায়স্তে কাল কাটাস।
পাকা চুলে পরিস্ সিঁদুর হয়ে থাকিস স্বামীর সো।
বেঁচে থাকিস যতকাল অক্ষয় থাক তোর হাতে নো।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে গঙ্গাজলে দেহ রাখিস।
লহ লহ এই আশিস।

www.nagorikpathagar.org

চিঠিপত্র

(১)

বাবানিনামণি!

তোমারও চিঠি পেয়েছি–চমৎকার লেখা তোমার। তোমাকে এইবার সায়েব বাড়িতে চাকরি করে দেবো। তোমার ফুল পেয়েছি। চমৎকার ফুল– সুন্দর গন্ধ। ভগবানকে দিয়েছি তোমার ফুল। তিনি তোমার ফুল পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। তোমাকে চুমু দিয়েছেন তিনি। কালি ফুরিয়ে গেল, তাই পেন্সিলে লিখছি। তোমরা বীর ছেলে হয়ে উঠবে, দুষ্টুমী করো না, কেঁদো না, জল ঘেঁটো না। আমি রোজ তোমাকে দেখে আসি চুমু খাই– তোমরা যখন ঘুমোও। চণ্ডীর সঙ্গে খেলা করবে। ঘুমোলে আমায় দেখতে পাবে। তখন আমি কোলে নেব। আবার ফুল পাঠিয়ো– তোমাদের ভগবানকে দেবো ওগুলো। চুমু নাও। ইতি–

তোমার বাবা

[এই চিঠিখানা কবি তাঁর কনিষ্ঠপুত্র কাজী অনিরুদ্ধকে লিখেছিলেন]

(২)

আদাব হাজার হাজার জানবেন!

বা'দ আরজ, আমার নগণ্য লেখাটি আপনাদের সাহিত্য পত্রিকায় স্থান পেয়েছে, এতে কৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে আমি আশ্চর্য হয়েছি বেশী। আমার সব চেয়ে বেশী ভয় হয়েছিল, পাছে বেচারী লেখা 'কোরকে'র কোঠায় পড়ে। অবশ্য যদিও আমি 'কোরক ব্যতীত প্রস্ফুটিত ফুল নই, আর যদিই সে রকম হয়ে থাকি কারুর চক্ষে, তবে সে বেমালুম ধুতরো ফুল। যা হোক, আমি তার জন্যে আপনার নিকট যে কত বেশী কৃতজ্ঞ, তা প্রকাশ করবার ভাষা পাচ্ছিনে। আপনার এরূপ উৎসাহ বরাবর থাকলে আমি যে একটি মস্ত জবর কবি ও লেখক হব, তা হাতে কলমে প্রমাণ করে দিব, এ একেবারে নির্ঘাৎ সত্যি কথা। কারণ, এবারে পাঠালুম একটি লম্বা চওড়া 'গাথা' আর একটি প্রায় দীর্ঘ গল্প আপনাদের পরবর্ত্তী সংখ্যা কাগজে ছাপাবার জন্যে, যদিও কার্তিক মাস এখনও অনেক দূরে। আগে থেকেই পাঠালুম, কেননা এখন হতে এটা ভাল করে পড়ে রাখবেন এবং চাই কি আগে হতে ছাপিয়েও

www.nagorikpathagar.org

রাখতে পারেন। তা ছাড়া আর একটি কথা। শেষে হয়ত ভাল ভাল লেখা জমে আমার লেখাকে বিলকুল 'রদ্দি' করে দেবে, তখন হয়ত এত বেশী লেখা নাও পড়তে পারেন। কারণ, আমি বিশেষরূপে জানি সম্পাদক বেচারাদের গলদঘর্ম হয়ে উঠতে হয় এই নতুন কাব্যি রোগাক্রান্ত ছোকরাদের দৌরাত্মিতে। যাক অনেক বাজে কথা বলা গেল। আপনার সময়টাকেও খামকা টুটি চেপে রেখেছিলুম। এখন বাকি কথাকটি মেহেরবানী করে শুনুন।

যদি কোন লেখা পছন্দ না হয় তবে ছিঁড়ে না ফেলে এ গরীবকে জানালেই আমি ওর নিরাপদে প্রত্যাগমনে পাথেয় পাঠিয়ে দেব। কারণ, সৈনিকের বড় কষ্টের জীবন। আর তার চেয়ে হাজার গুণ পরিশ্রম করে একটু একটু লিখি। আর কারুর কাছে এ একেবারে worthless হলেও আমার নিজের কাছে ওর দাম ভয়ানক। আর ওটা বোধহয় সব লেখকের পক্ষেই স্বাভাবিক। আপনার পছন্দ হ'ল কিনা, জানাবার জন্যে আমার নাম ঠিকানা লেখা একখানা stamped খামও দেওয়া গেল এর সঙ্গে। পড়ে মত জানাবেন।

আর যদি এত বেশী লেখা ছাপাবার মত জায়গা না থাকে আপনার কাগজে, তাহলে যে কোনও একটা লেখা সওগাতের সম্পাদককে hand over করলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হব। 'সওগাতে' লেখা দিচ্ছি দু-একটা করে। যা ভাল বুঝবেন জানাবেন।

গল্পটি সম্বন্ধে আপনার কিছু জিজ্ঞাসা বা বক্তব্য থাকলে জানালেই আমি ধন্যবাদের সহিত তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দিব, কারণ, এখনও অনেক সময় রয়েছে।

আমাদের এখানে সময়ের Money value, সুতরাং লেখা সর্বাঙ্গসুন্দর হতেই পারে না। Undisturbed time মোটেই পাই না। আমি কোন কিছুরই কপি বা duplicate রাখতে পারি না। সেটি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

By the by, আপনারা যে 'ক্ষমা' বাদ দিয়ে কবিতাটির 'মুক্তি' নাম দিয়েছেন তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এই রকম দোষগুলি সংশোধন করে নেবেন। বড়্ডো ছাপায় ভুল থাকে, একটু সাবধান হওয়া যায় না কি? আমি ভাল। আপনাদের কুশল সংবাদ দিবেন। নিবেদন ইতি–

খাদেম/নজরুল

[বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদককে লেখা একটা চিঠি। একে কেউ কেউ কবির প্রকাশিত প্রথম চিঠি হিসেবে অনুমান করে থাকেন

www.nagorikpathagar.org

যৌবনের গান

আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে, যাঁহারা কর্মী নন–ধ্যানী। যাঁহারা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ যদি না-ই হন, অন্তত ক্ষুদ্র নন। ইঁহারা থাকেন শক্তির পিছনে রুধির ধারার মত গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মত অলক্ষ্যে।

আমি কবি–বনের পাখির মত স্বভাব আমার গান করায়। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স-ফিঙে যখন বেচারা গানের পাখিকে তাড়া করে, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আন্ গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান। সে গান করে আপন মনের আনন্দে– যদি তাহাতে কাহারও অলস-তন্দ্রা মোহ-নিদ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্ত দৈব। যৌবনের সীমা পরিক্রমণ আজও আমার শেষ হয় নাই, কাজেই আমি যে গান গাই, তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা-ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে, তাহা আমার অগোচরে। যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায় সে হয়ত তাহার শক্তি সম্বন্ধে আজও না-ওয়াকিফ্।

আমি বক্তাও নহি। আমি কমবক্তার দলে। বক্তৃতায় যাঁহারা দিগ্বিজয়ী–বক্তিয়ার খিলজী, তাঁহাদের বাক্যের সৈন্য-সামন্ত অত দ্রুতবেগে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে, বলিতে পারি না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ সেন অপেক্ষাও আমরা বেশি অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারার মত অবিরল ধারায়। আমাদের কবিদের বাণী বহে ক্ষীণ ভীরু ঝর্নাধারার মত। ছন্দের দুকূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সঙ্গীত-গুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়। পদ্মা ভাগীরথীর মত খরস্রোতা যাঁহাদের বাণী, আমি তাঁহাদের বহু পশ্চাতে।

আমার একমাত্র সম্বল– আপনাদের তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে, যৌবনকে, আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি সেইদিন হইতে বারেবারে সালাম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি; জবাকুসুম-সঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ– প্রভাত তেমনি স্বশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি; তাহার স্তবগান গাহিয়াছি। তরুণ অরুণের মতই যে তারুণ্য তিমির-বিদায়ী, সে যে আলোর দেবতা। রঙের খেলা

www.nagorikpathagar.org

খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন-সূর্য যথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমির-কুন্তলা নিশীথিনীর সেই ত লীলাভূমি।

আমি যৌবনের পূজারী। কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের দলপতি হইয়া নয়, আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই, আজ আমরা শতদিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি, এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

বার্ধক্য তাহাই– যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব-মানবের অভিনব জয়-যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচ-কাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না। যাহারা জীবন হইয়াও জড়। যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণ-স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নব-অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণ-চঞ্চল শিশুদের কল-কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাৎ করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার– বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি– যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল-মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহারই– যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড প্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে।। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুইনদের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালা-পাহাড়ের অসিতে, কামাল-করিম-মুসোলিনি-সানইয়াৎ-লেনিনের শক্তিতে। যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে–যাহারা বৈমানিকরূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারকরূপে নব-পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়া যাহারা তুষার-ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিল-সমাধি লাভ করে, মঙ্গল-গ্রহে চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ

www.nagorikpathagar.org

হইয়া যায়, পবন-গতিতে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহারা উড়িয়া যাইতে চায়, নব নব গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়ন-মণি নিভিয়া যায়– যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তদের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি– শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশান ঘাটে, গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ-বন্যা পীড়িতদের মুখে, বন্ধহীন রোগীর শয্যাপার্শ্বে যখন সে রাত্রির পর জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া ভিখারি সাজিয়া দুর্দশা-গ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন সে দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশের বুকে আশা জাগায়।

ইহাই যৌবন, এই ধর্ম যাহাদের তাহারাই তরুণ। তাহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই। দেশ-কাল জাতি ধর্মের সীমার ঊর্ধ্বে ইহাদের সেনা-নিবাস। আজ আমরা-মুসলিম তরুণেরা– যেন অকুণ্ঠিত চিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি–ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরীদ যৌবনের। এই জাতি-ধর্ম-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাঁহাদের যৌবন তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাঁহাদিগকে সকল দেশের সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।

পথ-পার্শ্বের ধর্ম-অট্টালিকা আজ পড় পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম, ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে, তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই। খোদার দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মোনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশতি চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিকারির মত হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইব; ইহাই হউক তরুণের সাধনা।*

কলিকাতার দ্বিমাসিক 'সাম্যবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত, সিরাজগঞ্জে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী কর্তৃক আয়োজিত মুসলিম যুব-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

www.nagorikpathagar.org

তরুণের সাধনা

[১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি-রূপে কবি নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন।]

আমার প্রিয় তরুণ ভ্রাতৃগণ!

আপনারা কি ভাবিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আপনাদের সভাপতি নির্বাচন করিয়াছেন, জানি না। দেশের জাতির ঘনঘোর-ঘেরা দুর্দিনে দেশের জাতির শক্তিমজ্জা-প্রাণ-স্বরূপ তরুণদের যাত্রা-পথের দিশারী হইবার স্পর্ধা বা যোগ্যতা আমার কোনদিন ছিল না, আজও নাই। আমি দেশকর্মী– দেশনেতা নই, যদিও দেশের প্রতি আমার মমত্ববোধ কোন স্বদেশপ্রেমিকের অপেক্ষা কম নয়। রাজ-লাঞ্ছনা ও ত্যাগস্বীকারের মাপকাঠি দিয়া মাপিলে হয়ত আমি তাঁহাদের কাছে খর্ব (pigmy) বলিয়া অনুমিত হইব। তবু দেশের জন্য অন্তত এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি যে, দেশের মঙ্গল করিতে না পারিলেও অমঙ্গল-চিন্তা কোনদিন করি নাই, যাঁহারা দেশের কাজ করেন তাঁহাদের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াই নাই। রাজ-লাঞ্ছনার চন্দন-তিলক কোনদিন আমারও ললাটে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আজ মুছিয়া গিয়াছে। আজ তাহা লইয়া গৌরব করিবার অধিকার আমার নাই।

আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে যাঁহারা কর্মী নন– ধ্যানী। যাঁহারা মানব জাতির কল্যাণসাধন করেন সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ; কিন্তু সেই মহৎ হইবার প্রেরণা যাঁহারা জোগান, তাঁহারা মহৎ যদি নাই-হন অন্তত ক্ষুদ্র নন। ইহারা থাকেন শক্তির পেছনে রুধির-ধারার মত গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মত অলক্ষ্যে। আমি কবি। বনের পাখির মত স্বভাব আমার গান করায়। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বয়েস-ফিঙ্গে যখন বেচারা গানের পাখিকে তাড়া করে, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আর গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান। সে গান করে আপন মনের আনন্দে, যদি তাহাতে কাহারও অলস-তন্দ্রা মোহ-নিদ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্ত দৈব। যৌবনের সীমা পক্রিমণ আজও আমার শেষ হয় নাই, কাজেই আমি যে গান গাই তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা-ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া

www.nagorikpathagar.org

থাকে তাহা আমার অগোচরে। যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায় সে হয়ত তাহার শক্তি সম্বন্ধে আজও না-ওয়াকিফ্।

আমি বক্তাও নহি। আমি কমবক্তার দলে। বতৃতায় যাঁহারা দিগ্বিজয়ী-বক্তিয়ার খিলজী, তাঁহাদের বাক্যের সৈন্য-সামন্ত অত দ্রুতবেগে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে বলিতে পারি না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ সেন অপেক্ষাও আমরা বেশি অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারার মত অবিরল ধারায়। আমাদের–কবিদের বাণী বহে ক্ষীণ ভীরু ঝর্ণাধারার মত। ছন্দের দু'কূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সঙ্গীতগুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়। পদ্মা-ভাগীরথীর মত খরস্রোতা যাঁহাদের বাণী তাঁহাদের বহু পশ্চাতে।

আমার একমাত্র সম্বল, আপনাদের-তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে-যৌবনকে আমি যেদিন হইতে গান গাইতে শিখিয়াছি সেইদিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, তাজিম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি। গানে কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি, স্তব রচনা করিয়াছি। জবাকুসুম-সঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ-প্রভাতে তেমনি সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি। তাহার স্তব-গান গাহিয়াছি। তরুণ অরুণের মতই যে তারুণ্য তিমিরবিদায়ী সে যে আলোর দেবতা। রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন-সূর্য যথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমির-কুন্তলা নিশীথিনীর সেই ত লীলাভূমি।

আমি যৌবনের পূজারী। কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আমাদের মালার মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের এই মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের দলপতি হইয়া নয়-আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযোগী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই; আজ আমরা শত দিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি, এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া সর্বপ্রধান অভাব অনুভব করিতেছি আমাদের মহানুভব নেতা-বাংলার তরুণ মুসলিমের সর্বপ্রথম অগ্রদূত তারুণ্যের নিশান-বর্দার মৌলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী সাহেবের। সিরাজগঞ্জের শিরাজীর সাথে বাংলার শিরাজ বাংলার প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। যাঁহার অনল-প্রবাহ-সম বাণীর

www.nagorikpathagar.org

গৈরিক নিঃস্রাব জ্বালাময়ী ধারা মেঘ–নিরন্ধ্র গগনে অপরিমাণ জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছিল, নিদ্রাতুরা বঙ্গদেশ উন্মাদ আবেগ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, 'অনল প্রবাহের' সেই অমর কবির কণ্ঠস্বর বাণীকুঞ্জে আর শুনতে পাইব না। বেহেশতের বুলবুলি বেহেশতে উড়িয়া গিয়াছে। জাতির কওমের দেশের যে মহাক্ষতি হইয়াছে, আমি শুধু তাহারই কথাই বলিতেছি না, আমি বলিতেছি আমার একার বেদনার ক্ষতির কাহিনী। আমি তখন প্রথম কাব্য-কাননে ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিয়াছি–ফিঙে-বায়স-বাজপাখির ভয়ে ভীরু পাখির মত কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহিবারও দুঃসাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই, নখচঞ্চুর আঘাতও যে না খাইয়াছি এমন নয়– এমনি ভীতির দুর্দিনে মনি-অর্ডারে আমার নামে দশটি টাকা আসিয়া হাজির। কুপনে শিরাজী সাহেবের হাতে লেখাঃ "তোমার লেখা পড়িয়া খুশি হইয়া দশটি টাকা পাঠাইলাম। ফিরাইয়া দিও না, ব্যথা পাইব। আমার থাকিলে দশ হাজার টাকা পাঠাইতাম।" চোখের জলে স্নেহসুধাসিক্ত ঐ কয় পংক্তি লেখা বারে বারে পড়িলাম; টাকা দশটি লইয়া মাথায় ঠেকাইলাম। তখনো আমি তাঁহাকে দেখি নাই। কাঙাল ভক্তের মত দূর হইতেই তাঁহার লেখা পড়িয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি, শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি। সেইদিন প্রথম মানস-নেত্রে কবির স্নেহ-উজ্জ্বল মূর্তি মনে মনে রচনা করিলাম, গলায় পায়ে ফুলের মালা পরাইলাম। তাহার পর ফরিদপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে তাঁহার জ্যোতি বিমণ্ডিত মূর্তি দেখিলাম। দুই হাতে তাঁহার পায়ের তলার ধূলি কুড়াইয়া মাথায় মুখে মাখিলাম। তিনি আমায় একেবারে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন, নিজে হাতে করিয়া মিষ্টি খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। যেন বহুকাল পরে পিতা তাহার হারানো পুত্রকে ফিরাইয়া পাইয়াছে। আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া বাঙলার সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মনস্বী দেশ-প্রেমিকের কথাই বারে বারে মনে হইতেছে। এ যেন হজ্ব করিতে আসিয়া কাবা-শরীফ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া। তাঁহার রুহ্ মোবারক হয়ত আজ এই সভায় আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহারই প্রেরণায় হয়ত আজ আমরা তরুণেরা এই যৌবনের আরাফাত ময়দানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। আজ তাঁহার উদ্দেশে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে শ্রদ্ধা তসলিম নিবেদন করিতেছি, তাঁহার দোওয়া ভিক্ষা করিতেছি।

আপনারা যে অপূর্ব অভিনন্দন আমায় দিয়াছেন, তাহার ভারে আমার শির নত হইয়া গিয়াছে, আমার অন্তরের ঘট আপনাদের প্রীতির সলিলে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিয়াছে। সেই পূর্ণঘটে আর শ্রদ্ধা প্রতি নিবেদনের ভাষা ফুটিতেছে না। আমার পরিপূর্ণ অন্তরের বাকহীন শ্রদ্ধা প্রীতি সালাম আপনারা গ্রহণ করুন। আমি

www.nagorikpathagar.org

উপমহাদেশের শিলাবৃষ্টি করিতে আসি নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে যাহা না বলিলে নয়, শুধু সেইটুকু বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

আমি সর্বপ্রথমে বলিতে চাই, আমাদের এই তরুণ মুসলিম সম্মেলনের কোনো সার্থকতা নাই যদি আমরা আমাদের পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া বার্ধক্যে তাহাই–যাহা পুরাতনকে মিথ্যাকে মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয়যাত্রার পথে শুধু বোঝা নয়–বিঘ্ন; শতাব্দীর নব-যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দে মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না। যাহারা জীব হইয়াও জড়। যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণ স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই–যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণ-চঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাৎ করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাবিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার-বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি–যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কালমূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি–যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহার–যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ যঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড-প্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুইনদের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসাগরের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল-করিম-জগলুল-সানইয়াৎ-লেনিনের শক্তিতে। আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারকরূপে নব পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়া যাহারা তুষার ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিল-সমাধি লাভ করে, মঙ্গলগ্রহে, চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, পবন গতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহারা উড়িয়া যাইতে চায়, নব নব গ্রহ নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়ন-মণি নিভিয়া যায়– যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তদের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি-শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশান-ঘাটে, গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ-বন্যা-পীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপার্শ্বে যখন সে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে,-যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া, ভিখারি সাজিয়া

www.nagorikpathagar.org

দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন সে দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশের বুকে আশা জাগায়।

ইহাই যৌবন, এই ধর্ম যাহাদের–তাহারাই তরুণ। তাহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই। দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের সীমার ঊর্ধ্বে ইহাদের সেনানিবাস। আজ আমরা-মুসলিম তরুণেরা যেন অকুণ্ঠিত চিত্তে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি : ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরিদ যৌবনের। এই জাতি-ধর্ম-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছি যাঁহাদের যৌবন তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাঁহাদিগকে সকল দেশের, সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।

পথ-পার্শ্বের যে অট্টালিকা আজ পড়পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম; ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই। খোদার দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মোনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশত্ ও বেহেশতি চীজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারির মত হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইব, ইহাই হউক তরুণের সাধনা।

আমাদের বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামি, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলমানের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সমাজে কল্যাণকামী যে সব মৌলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনো-জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষ্যৎদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন– বেনো-জলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমির আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা যে কওমের জাতির ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান নাই বলিয়াই ইহাদের ক্ষমা করা যায়। ইহারা প্রায় প্রত্যেকেই 'মনে মনে শাহ ফরীদ, বগল-মে ইট।" ইহাদের নীতি 'মূর্দা দোযখ-মে যায় য়্যা বেহেশত্ মে যায়, মেরা হালুয়া রুটি-সে কাম।"

www.nagorikpathagar.org

"দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।" নীতি অনুসরণ না করিলে সভ্য জগতের কাছে আমাদের ধর্ম, জাতি আরো লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ হইবে। ইহাদের ফতুয়াভরা ফতোয়া। বিবি তালাক ও কুফরির ফতোয়া ত ইহাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দুই দশ গণ্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতুয়া-ধারী ফতোয়া-বাজদের হাত হইতে গরিবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে ত সে তরুণ। ইহাদের হাতের 'আষা' বা যষ্টি মাঝে মাঝে আজদাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়া তরুণ মুসলিমদের গ্রাস করিতে আসবে সত্য, কিন্তু এই 'আষা' দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিলে চলিবে না। এই ঘরোয়া-যুদ্ধ-ভাই-এর সহিত আত্মীয়ের সহিত যুদ্ধই—সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তবু উপায় নাই। যত বড় আত্মীয়ই হোক, তাহার যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ হইলে তাহাকে অন্যত্র না সরাইয়া উপায় নাই। যে হাত বাঘে চিবাইয়া খাইয়াছে, তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রাণরক্ষার উপায় নেই। অন্তরে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়াই এসব কথা বলিতেছি। চোগা-চাপকান দাড়ি-টুপি দিয়া মুসলমান মাপিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর আর সব দেশের মুসলমানদের কাছে আজ আমরা অন্তত পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। যাঁহারা বলেন, "দিন ত চলিয়া যাইতেছে, পথ ত চলিতেছি," তাহাদের বলি ট্রেন মোটর এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়িতে শুইয়া দুই ঘণ্টায় এক মাইল হিসেবে গদাই-লস্করি চালে চলিবার দিন আর নাই। যাহারা আগে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সঙ্গ লইবার জন্য যদি আমাদের একটু অতিমাত্রায় দৌড়াইতে হয় এবং তাহার জন্য পায়জামা হাঁটুর কাছে তুলিতে হয়, তাই না হয় তুলিলাম। ঐ টুকুতেই কি আমার ঈমান বরবাদ হইয়া গেল? ইসলামই যদি গেল, মুসলিম যদি গেল, তবে ঈমান থাকিবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া? যাক্ আর শত্রু বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। তবে ভরসা এই যে, বিবি তালাকের ফতোয়া শুনিয়াও কাহারও বিবি অন্তত বাপের বাড়িও চলিয়া যায় নাই।

আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনের এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাঙলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাস-রোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজু-বুড়ির বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষা-পোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জমার অংক তাল সামলাইয়া চলিতে পারে না। অথচ ইহাদেরই পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশি। আর ইহাদের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া

www.nagorikpathagar.org

মরিতেছে আলো-বায়ুর অভাবে। এই সব যক্ষ্মারোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্য-সুন্দর প্রতিভা-দীপ্ত বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া! ফাঁসির কয়েদিরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে। আমরা ইসলামী সেই অনুশাসনগুলির প্রতিই জোর দিয়া থাকি, যাহাতে পয়সা খরচ হইবার ভয় নাই।

কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চির-বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ, কিসের যে অভাব তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না–সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে–নারী।

বৃদ্ধদের আয়ুর পুঁজি ত ফুরাইয়া আসিল, এখন আমাদের– তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চির-বন্দিনী মাতা ভগ্নিদের উদ্ধার সাধন। জন্ম হইতে দাঁড়ে বসিয়া যে পাখি দুধ-ছোলা খাইয়াছে, সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, সেও উড়িতে পারে। বাহিরে তাহারই স্বজাতি পাখিকে উড়িতে দেখিয়া অন্য কোন জীব বলিয়া ভ্রম হয়। এই পিঞ্জরের পাখির দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদার দান এই আলো-বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মত হীনবীর্য সন্তানের জন্ম।

শুধু কি ইহাই? আমাদের সম্মুখে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা তাহার উত্তর দিতে পারে তরুণ, সমাধান করিতে পারে তরুণ। সে বলিষ্ঠ মন ও বাহু আছে একা তরুণের। সম্মুখে আমাদের পর্বত-প্রমাণ বাধা নিরাশার মরুভূমি, বিধি-নিষেদের দুস্তর পাথর; এই সব লঙ্ঘন করিয়া অতিক্রম করিয়া যাইবার দুঃসাহসিকতা যাহাদের– তাহারা তরুণ।

ইহাদের জন্য চাই আমাদের একাগ্রতা, একনিষ্ঠ, সাধনা, চাই সংঘ। আজ আমরা, বাঙলার মুসলিম তরুণেরা যুথভ্রষ্ট। আমাদের সংঘ নাই, সাধনা নাই, তাই সিদ্ধিও নাই। আমাদের চারিপাশে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু যুবকদের দেখিতেছি-কি অপূর্ব তাহাদের ঐক্য, ত্যাগ, সাধনা। তাহারা সকলে যেন এক দেহ, এক প্রাণ। সকল বৈষম্য বিরোধের ঊর্ধ্বে তাহারা তাহাদের যে সংঘ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। জগতের যে কোনো যুব-আন্দোলনের সঙ্গে তাহারা আজ

www.nagorikpathagar.org

চ্যালেঞ্জ করিতে পারে। এই সংঘ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে কত বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না। ইহারা পিতা-মাতার স্নেহ, ভাই-ভগ্নির প্রীতি, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের ভালোবাসা, প্রিয়ার বাহু-বন্ধন, গৃহের সুখ-শান্তি, ঐশ্বর্যের বিলাস, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোহ, সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে জাতির জন্য, দেশের জন্য, মানবের কল্যাণের জন্য। এই তরুণ বীর সন্ন্যাসীর দল আছে বলিয়াই আজও আমরা দিনের আলোকে মুখ দেখিতে পাইতেছি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ইহারা নচিকেতার মত প্রশ্ন করে, মৃত্যুর বজ্রমুষ্টি হইতে জীবনের সঞ্চয় ছিনাইয়া আনে। এই বনচারী বীরাচারীর দলই দেশের যৌবনে ঘূণ ধরিতে দেয় নাই।... আমাদের মত ইহাদের স্কন্ধে চাকুরির দৈণ্য সিন্ধবাদের মত চাপিয়া বসে নাই। ইহারাই সত্যকার আজাদ, বাঁদনহারা। সকল বন্ধন সকল মায়াকে অস্বীকার করিয়া তবে আজ ইহারা এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইউনিভার্সিটির কত উজ্জ্বলতম রত্ন– যাহারা আজ অনায়াসে জজ ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার প্রফেসর হইয়া নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করিত, তাহারা রাস্তায় প্রাণ ফিরি করিয়া ফিরিতেছে। ইহারা আছে বলিয়াই ত মেরুদণ্ডহীন বাঙালি জাতি আজও টিকিয়া আছে। দীপ-শলাকার মত ইহারা নিজেদের আয়ু ক্ষয় করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রাণ–প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিতেছে।... আমাদের মুসলমান তরুণেরা লেখাপড়া করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকুরি অর্জনের জন্য। গাধার 'ফিউচার প্রসপেক্টের' মত আমরা ঐ চাকরির দিকে তীর্থের কাকের মত হা করিয়া চাহিয়া আছি। বি-এ, এম-এ, পাশ করিয়া কিছু যদি না হই ত অন্তত সাবরেজিস্টার বা দারোগা হইবই হইব, এই যাহাদের লক্ষ্য, এত স্বল্প যাহাদের আশা, এত নিম্নে যাহাদের গতি– তাহাদের কি আর মুক্তি আছে? এই ভূত ছাড়িয়া না গেলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইব। এই ভূতকে ছাড়াইবার ওঝা আপনারা যুবকের দল। আমাদেরই প্রতিবেশী তরুণ শহীদদের আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, তা হইলে আমাদের স্থান সভ্য জগতের কোথাও নাই। চাকুরির মোহ, পদবির নেশা, টাইটেলের বা টাই ও টেলের মায়া যদি বিসর্জন না করিতে পারি, তবে আমাদের সংঘ প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর-পরাহত । কোথায় আছে সেই শহীদের দল? বাহির হইয়া আইস আজ এই মুক্ত আলোকে, উদার আকাশের নীল চন্দ্রাপতলে। তোমাদের অস্থি-মজ্জা প্রাণ-দেহ, তোমাদের সঞ্চিত জ্ঞান, অর্জিত ধন-রত্নের উপর প্রতিষ্ঠা হইবে আমাদের সংঘের– তরুণ সংঘের। সকল লাভ-লোভ-যশ-খ্যাতিকে পদদলিত করিয়া মুসাফিরের বেশে ভিক্ষুকের ঝুলি লইয়া যে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে– এ সাধনা তাহারই, এ শহীদি দরজা শুধু তারাই।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের লক্ষ্য হইবে এক, কিন্তু পথ হইবে বহুমুখী। যে দুর্ধর্ষ, সে কাল-বৈশাখীর কেতন উড়াইয়া অসম্ভবের অভিযানে যাত্রা করুক; যে বীর তাহার জন্য রহিয়াছে সংগ্রামক্ষেত্র; যে কর্মী তাহার জন্য পড়িয়া রহিয়াছে কর্মের বিপুল উপত্যকা; কিন্তু যে ধ্যানী যে সুন্দরের পূজারী, সে কল্প-পাখায় ভর করিয়া উড়িয়া যাক স্বপ্নলোকে, উদার নিঃসীম নীল নভে। সেই স্বপ্ন-পুরী হইতে সে যে স্বপন-কুমারীকে, রূপ-কুমারীকে জয় করিয়া আনিবে তাহার লাবণীতে আমাদের কর্মকান্ত ক্ষণগুলি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিবে। যে গাহিতে জানে, গানের পাখি যে তাহাকে ছাড়িয়া দিব দূর-বিথার বনানীর কোলে-আমাদেরই আশেপাশে থাকিয়া আমাদের অবসাদক্লিষ্ট মুহূর্তকে সে গানে গানে ভরিয়া তুলিবে, প্রাণে নব-প্রেরণার সঞ্চার করিবে। ইহারা আমাদের সুন্দর সাথী। বাড়ির উঠানের ফুলে ফুলে ফুল্ল লতাটির পানে চাহিয়া যেমন রৌদ্র-দগ্ধ চক্ষু জুড়াইয়া লই, তেমনি করিয়া ইহাদের কবিতায় গানে ছবিতে আমরা আমাদের বুভুক্ষু অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইব, অবসাদ ভুলিব।

বিধি-নিষেধের বাধা আমরা মানিব না। গান গাওয়াই যাহার স্বভাব, সেই গানের পাখিকে কোন অধিকারে গলা টিপিয়া মারিতে যাইবে? সুন্দরের সৃষ্টির শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, কে তাহার সৃষ্টি হেরিয়া কুফরির ফতোয়া দিবে?

এই খোদার উপর খোদকারী আর যারা করুক, আমরা করিব না।

পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান-প্রধান দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এই ভারতেরই সকল প্রদেশের আজও যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী-কি কণ্ঠ সঙ্গীতে, কি যন্ত্র সঙ্গীতে, তাহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

অথচ সে দেশের মৌলভী মৌলানা সাহেবান আমাদের দেশের মৌলভী সাহেবানদের অপেক্ষাও জবরদস্ত। তাঁহারা ঐসব গুণীদের অপমান বা সমাজচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বরং তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করেন বলিয়াই জানি। সঙ্গীতশিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি-নিষিধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।

আজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্রশিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এইসবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া বুঝিতে হইবে। নতুবা আর্টে বাঙালি মুসলমানের দান বলিয়া কোনো কিছু থাকিবে না। পশুর মত সংখ্যা গরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি,

www.nagorikpathagar.org

যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড়– শ্রেষ্ঠ।

আমার অভিভাষণ হয়ত অতিভাষণ হইতে চলিল। আমার শেষ কথা– আমরা যৌবনের পূজারী, নব-নব সম্ভাবনার অগ্রদূত, নব নবীনের নিশানবর্দার। আমরা বিশ্বের সর্বাগ্রে চলমান জাতির সহিত পা মিলাইয়া চলিব। ইহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে যে, বিরোধ আমাদের শুধু তাহার সাথেই। ঝঞ্ঝার নূপুর পরিয়া নৃত্যায়মান তুফানের মত আমরা বহিয়া যাইব। যাহা থাকিবার তাহা থাকিবে, যাহা ভাঙ্গিবার তাহা আমাদের চরণাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবেই। দুর্যোগ রাতের নিরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত হউক আমাদের প্রাণ-প্রদীপ্তি! সকল বাধা-নিষেধের শিখর-দেশে স্থাপিত আমাদের উদ্ধত বিজয়-পতাকা! প্রাণের প্রাচুর্যের আমরা যেন সকল সঙ্কীর্ণতাকে পায়ে দলিয়া চলিয়া যাইতে পারি।

আমরা চাই সিদ্দিকের সাচ্চাই, ওমরের শৌর্য ও মহানুভবতা, আলির জুলফিকার, হাসান-হোসেনের ত্যাগ ও সহনশীলতা। আমরা চাই খালেদ-মুসা-তারিফের তরবারি, বেলালের প্রেম। এইসব গুণ যদি অর্জন করিতে পারি, তবে জগতে যাহারা আজ অপরাজেয় তাহাদের সহিত আমাদের নামও সসম্মানে উচ্চারিত হইবে।

———

www.nagorikpathagar.org

ISBN : 984-70315-0196-7